সাপ্তাহিক সংকলন

রেজিঃ ডিএ ৬০৫৮ | সংখ্যা-৮ | সোমবার, ২৭ কার্তিক ১৪২০, ০৬ মহররম ১৪৩৫, ১১ নভেম্বর ২০১৩ | ৩২ পৃষ্ঠা-১০ টাকা

কিভাবে জন্ম হোল দাজ্জালের! পৃষ্ঠ-৮

জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই 'দাসত্ব' পৃষ্ঠা-১৬

কারা গোপন কারা প্রকাশ্য? পৃষ্ঠা-৩২

রাজা অষ্টম হেনরী

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ

দৈনিক
দেশেরপত্র

www.desherpatro.com

দৈনিক
দেশেরপত্র

মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ

সম্পাদকীয়

আমি হব সকাল বেলার পাখি

সম্পাদকীয় হলো সম্পাদক ও পাঠকের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন। আমরা পত্রিকার পাতায় সবসময় যে ভঙ্গী ও আঙ্গিকে সম্পাদকীয় লিখতে ও পড়তে অভ্যস্ত, আজকের সম্পাদকীয় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নভাবেই উপস্থাপন করছি। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কবিতা ও আমার উপলব্ধিই আজকের সম্পাদকীয়:

আমি হব সকাল বেলার পাখি / সবার আগে কুসুম বাগে / উঠব আমি ডাকি। / সুয্যি মামা জাগার আগে উঠব আমি জেগে, / 'হয়নি সকাল, ঘুমোও এখন' মা বলবেন রেগে। / বলব আমি-'আলসে মেয়ে ঘুমিয়ে তুমি থাক,/ হয়নি সকাল, তাই বলে কি সকাল হবে নাকো?'/ আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?/ তোমার ছেলে উঠবে মা গো রাত পোহাবে তবে।

ছোটবেলা এই কবিতাটি পাঠ্যপুস্তকে থাকার সুবাদে বহুবার পড়েছি। অনেক সময় দলবেধে কয়েকজন মিলে পড়তাম; কিন্তু কবি কেন এই কবিতা লিখেছেন তার কিছুই তখন বুঝি নি। আজ এই পরিণত বয়সে আন্দাজ কোরতে পারছি বিদ্রোহী কবি নজরুল এ কবিতায় কী বুঝাতে চেয়েছেন। আমার কাছে এই কবিতা নতুনভাবে ধরা দিয়েছে। আমার অনুভূতি পাঠকের সঙ্গে ভাগাভাগি করার জন্য পেশ করলাম, জানি না ক'জন আমার সঙ্গে একমত হবেন।

এখানে 'সকাল বেলা' বোলতে কবি দিনবদলের কথা, নতুন সভ্যতার কথা বলেছেন। যেখানে অন্ধকার, গোলামী, হানাহানি, অভাব, দারিদ্র্য, অন্যায়, অবিচার থাকবে না। আর অন্ধকার দিনের অবসান ঘটিয়ে শুভ সকাল অর্থাৎ নয়া সভ্যতার শুরুতেই জেগে উঠবেন কবি এবং জাতিকে গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত করবেন। সকাল বেলায় পাখি যেমন নতুন দিনের আগমনী বার্তা ঘোষণা করে, মানুষকে ঘুম থেকে জাগায় তেমনি কবিও একটি আলোকময় নতুন সভ্যতার ঘোষক হোতে চান। তাই তিনি জাগতে চান দিন শুরু হওয়া অর্থাৎ 'সুয্যি মামা' জাগার আগেই।

মা এখানে পুরাতন জরাজীর্ণ সমাজের প্রতীক। একটি নতুন সভ্যতার জন্ম দিতে যখন কিছু মানুষ রাজপথে নেমে আসে, বিপ্লবের স্বপ্ন দেখে, তখন প্রাচীনপন্থীরা তাদের বহুযুগের সংস্কারকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। তারা ধমক দিয়ে বলে, "হয় নি সকাল ঘুমোও এখন"। এইভাবে তারা নতুনদেরকে ঘরে আটকে রাখতে চায়। তাদের প্রতি কবি বলছেন, মা, তুমি আলসে হতে পার, অত্যাচারকে মুখ বুজে সইতে পার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করতে পারো, কিন্তু তাই বলে কি সমাজ পরিবর্তন হবে না? নতুন সভ্যতার আগমন ঘটবে না? নতুন দিনের সূর্য উঠবেই উঠবে। কেউ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তোমার ছেলে উঠুক না উঠুক, জাগুক না জাগুক, অন্যরা জাগবেই। তাদের ঘুম ভাঙবেই।

শেষ চার চরণে কবি অভিমানের সুরে বোলেছেন, আমাকে তো জাগতেই হবে। আমরা না জাগলে কিভাবে সকাল হবে? অন্ধকার গোলামী, জুলুম, অত্যাচার এর অবসান ঘটিয়ে মুক্তির, সত্যের, ন্যায়ের প্রভাত আমাকেই তো আনতে হবে। তোমার মতো মায়েরা যদি তাদের সন্তানদের আদর কোরে ঘুম পাড়িয়ে রাখে তবে জাতির কখনও মুক্তি আসবে না। জাতির জীবন থেকে রাতের নিকষ অন্ধকার দূর হবে না। অন্যায়, অবিচার, অশান্তির কালো মেঘ দূরীভূত হয়ে ন্যায় ও শান্তির আলোকময় সভ্যতা শুরু হবে না। কাজেই মাগো তোমরা আর তোমাদের সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে রেখ না। তাদের জাগাও, তাদের জাগতে দাও। তাদের কানে ঘুম পাড়ানী গান নয়, বিপ্লবের মন্ত্র গাও। অন্ধকার দূর হবেই হবে। মুক্তির নতুন প্রভাত আসবেই আসবে।

সূচিপত্র

হতাশ করল গণতন্ত্র-২
বিষবৃক্ষে অমৃত ফলের আশা-৩
নেতৃত্বের আকাঙ্খাই প্রথম অযোগ্যতা-৪
হেযবুত তওহীদ সত্যের উপর অটল থাকবে এনশা'আল্লাহ-৬
কড়াই থেকে চুলা কম উত্তপ্ত নয়-৭
কিভাবে জন্ম হোল দাজ্জালের!-৮
দুনিয়া ত্যাগ করা নয় দুনিয়া সুন্দর করাই এসলাম-১০
জনগণ কী চায় আর কী পায়?-১৩
অন্যায়রোধে উপদেশ যথেষ্ট নয় রাষ্ট্রশক্তির প্রয়োজন আছে-১৪
জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই 'দাসত্ব'-১৬
মেয়ে হোয়ে কেন পত্রিকা বিক্রি করো?-২৪
রসুলাল্লাহ কেমন ছিলেন?-২৫
সত্য কোথায়?-২৭
লক্ষ্মীপুরবাসীর প্রতি আমার কিছু কথা -২৭
এ জাতি কী কোরে মোসলেম দাবি করে?-২৮
উশৃঙ্খলতাই কি আধুনিকতার মানদণ্ড?-২৮
পাঠকের প্রশ্নের উত্তর: সনাতন ধর্মেও ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ-২৯
ধর্মগুলির আদি ও অন্তমিল-৩০
যদি সমাধান চাই-৩১
কারা গোপন কারা প্রকাশ্য?-৩২

সম্পাদক: শাহানা পন্নী (রুফায়দাহ)
প্রকাশক : এডভোকেট আমিনুল হক আকবর। সম্পাদক কর্তৃক মিতু প্রিন্টিং প্রেস, ১০/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ২২৩, মধ্য বাসাবো (সবুজবাগ থানা সংলগ্ন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪।
ফোন: ০২-৭২১৮১১১, ০১৭৭৮২৭৬৭৯৪, বিজ্ঞাপন বিভাগ: ০১৮১৯২৭৮৭৮২, ইমেইল: desherpattro13@yahoo.com

হতাশ করল গণতন্ত্র

ইয়াসীন হোসেন পাভেল

বাংলাদেশে রাজনৈতিক সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে। সরকার ও বিরোধীদল উভয়ে নিজেদের অবস্থানে অনড় আছে। ফলে কোন সমাধান ছাড়াই নিজেরা নিজেদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার কর্মসূচি গ্রহণ করছেন। সরকারবিরোধী আন্দোলন যেমন ব্যাপক হচ্ছে অপরদিকে সরকার এসব আন্দোলন দমন করতেও ব্যাপক শক্তি প্রয়োগ করছে। জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনে এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। অতীতের আলোকে বিবেচনা করলে সকলেই একমত হবেন যে, এটা আজ নতুন নয়। আমাদের ইতিহাসও মোটামুটিভাবে এই-ই। সরকার আর বিরোধীদের মাঝে বছরের পর বছর টান টান উত্তেজনা বিরাজমান থাকে। সেই সাথে চলে একে অপরকে উপেক্ষা করে কিভাবে নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করা যায় তার হীন প্রতিযোগিতা। এই একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি দেখে দেখে দেশের আপামর জনতা অভ্যস্ত হয়ে গেছে। নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারাই আজ দেশের ১৬ কোটি মানুষ পদে পদে নির্যাতিত হচ্ছে, অপদস্থ হচ্ছে। বলা হয়ে থাকে গণতন্ত্র হল জনগণের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। এটা নাকি গণতন্ত্রের নীতি। আদর্শ বা ঐতিহাসিক সফলতা ইত্যাদি দ্বারা যতটা না গণতন্ত্র বিশ্বপরিচিতি এবং ব্যাপকতা লাভ করেছে তার চেয়ে ঢের বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছে এর এই নীতিকথার কারণে। কাজেই এর বাস্তবতা ব্যাখ্যা করা আবশ্যক। আমি এখানে উদাহরণ হিসেবে অন্য কোনো দেশকে তুলে আনতে চাই না। কারণ, সমস্যা যেহেতু আমাদের, কাজেই উদাহরণ হিসেবে ভাবতে হবে আমাদের পরিস্থিতিকেই। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, শুধু আমাদের দেশেই এরকম রাজনৈতিক অচলাবস্থা চলছে তা কিন্তু নয়, বরং সমস্ত পৃথিবী জুড়েই চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতার লাগামহীন বাড়বাড়ন্ত।

কথা বলছিলাম গণতন্ত্রের নীতি নিয়ে। আদর্শ আর বাস্তবতা যদি এক না হয় তাহলে ঐ আদর্শের আর কোনো দাম থাকে না। কাজেই হয় ঐ বাস্তবতাকেই আদর্শ হিসেবে মেনে নিতে হয় নইলে দুটোকেই প্রত্যাখ্যান করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

"আমরা হলাম জনগণ। আমাদের প্রতিনিধিত্ব করেন সংসদ সদস্যগণ। তারাই আমাদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার শর্তে সরকার গঠন করেন। অর্থাৎ সরকার যা করেন তা জনগণের ইচ্ছারই প্রতিফলন। জনগণ যা চায়, সরকার তাই করতে বাধ্য থাকে।" এই হলো গণতন্ত্রের তত্ত্বকথা। কিন্তু বাস্তবতা কি বলে? ঠিক উল্টো। বলুন তো, জনগণ কি হরতাল চায়? জনগণ কি গুলি, বোমা, ককটেলের আওয়াজ শুনতে চায়? জনগণ কি রাজনৈতিক কর্মীদের আর পুলিশের মারামারির মাঝে পড়ে জীবন হারাতে চায়? গুলিবিদ্ধ হতে চায়? পঙ্গু হতে চায়? চায় না। তাহলে এটা কিসের গণতন্ত্র? মাসের পর মাস একটি সংলাপের মুলো জাতির সামনে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যারা জনগণের মুখের পানে চেয়ে, দেশের স্বার্থে এক মিনিটের জন্য নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদকে সরিয়ে আলোচনা পর্যন্ত করতে সক্ষম নয়, তারা কি মানুষের জন্য রাজনীতি করেন? তারা কি দেশের আপামর জনসাধারণের প্রতিনিধি?

হয়তো বলবেন তারা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন না বলেই তো দেশের আজ এই অবস্থা। তাহলে এর সমাধান কি? দিশাহারা জনগণের সামনে সমাধান একটাই। তাহলো সরকার পরিবর্তন। সরকার পরিবর্তন করলেই যেন তাদের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে এবং জনগণ আবারো সেই কাজটিই করতে যাচ্ছে। এটা নিছক আত্মতুষ্টির অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যারা জাতির সম্মানিত চেয়ারগুলোতে বসে সুশীল, বুদ্ধিজীবী ইত্যাদি বিশেষণ ধারণ করে আছেন তাদের কাছে সমাধান অন্য। তারা আরো একটু গভীরে চিন্তা করে থাকেন। কিন্তু যতটা গভীরে গেলে প্রকৃত মুক্তি আসবে ততটা গভীরে যেতে পারেন না। তাদের ভাষায়- "আমাদের দেশে এখনও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নি। গণতন্ত্র নাকি এখনো তার শৈশবকাল পার করছে। এর সযত্ন পরিচর্যা হলেই নাকি দেশের মানুষ সত্যিকার শান্তিতে বসবাস করতে পারবে।" আমি বলব, এটা অনেক পুরোনো মত। এটা তারা সেই পাকিস্তান আমল থেকেই বলে আসছেন। যুগের পর যুগ পার হয়ে যাচ্ছে, শত শত মানুষ অন্যায়-অবিচারের যাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছে, শত শত মায়ের বুক খালি হচ্ছে, রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে রাজপথ কিন্তু শিশু সেই গণতন্ত্র তো শারীরিক বা মানসিকভাবে বড় হচ্ছে না। বরং বাস্তবতায় মনে হচ্ছে সেটা সব দিক দিয়ে শুধু ক্ষয়ে যাচ্ছে। এর শেষ পরিণতি চিন্তা করার সময় কি এখনও আমাদের আসে নি? এখনও যদি আমরা প্রকৃত মুক্তির পথে, শান্তির পথে ধাবিত না হই তাহলে ভবিষ্যৎ পরিণতি হয়তো আরো ভয়াবহ হবে। আমরা পছন্দ করি বা না করি, বুঝি বা না বোঝার ভান করে থাকি, সমাধান কিন্তু একটাই আর তাহলো স্রষ্টা প্রদত্ত সিস্টেমে ফিরে যাওয়া। তাঁর দেওয়া সিস্টেমে যে প্রকৃত শান্তি তা ইতিহাস। মানবরচিত কোন জীবনব্যবস্থাই সেই ইতিহাসের একটি ভগ্নাংশও মানবজাতিকে উপহার দিতে পারে নাই।

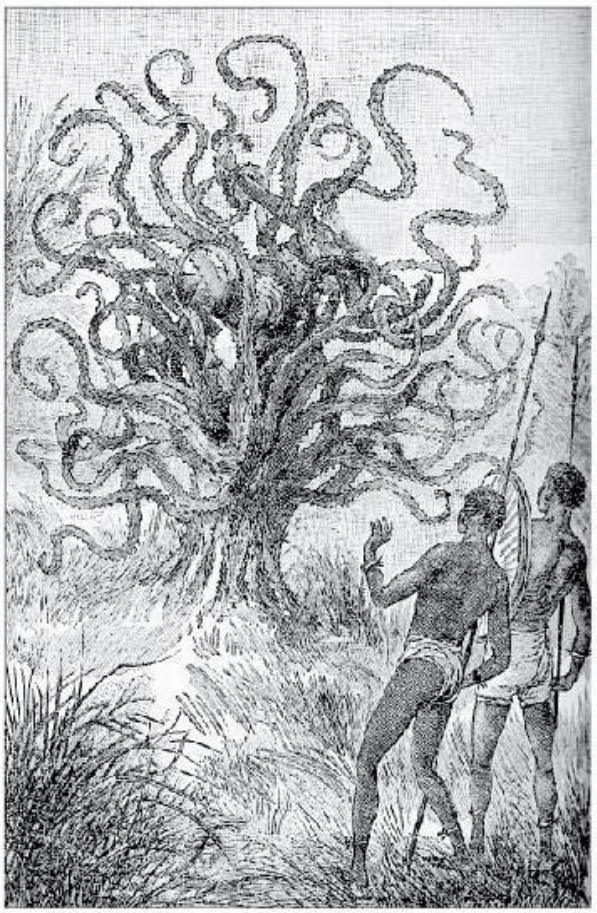

বিষবৃক্ষে অমৃত ফলের আশা

মো: হাসানুজ্জামান

বহুদিন আগের কথা, এক দ্বীপে একটি অমৃত ফলের বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষটি খুব সুন্দর ও প্রাণবন্ত, বৃক্ষের ছায়ায় সুশোভিত ছিল ঐ দ্বীপের পরিবেশ। সারা বছর ধরে ঐ বৃক্ষটি অমৃত ফল দিতে থাকত। এই অমৃত ফল খেয়ে সমস্ত রোগ, ব্যাধি ভালো হয়ে যেতো। কিন্তু দ্বীপের অধিবাসীরা ঐ বৃক্ষের কোন যত্নই করতো না বরং বৃক্ষের পাতা ছিড়ে গরু ছাগলকে খাওয়াতো, ডাল ভেঙে ফেলতো। একসময় দ্বীপবাসীর অত্যাচারে, অবহেলায় বৃক্ষটি ধীরে ধীরে রুগ্ন হতে থাকল, তারপর একদিন মারা গেল। এতে দ্বীপবাসীর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না। তারপর কিছুকাল পরে ক্রমে ক্রমে দ্বীপবাসীর মধ্যে রোগ বালাই দেখা দিতে থাকল। কিন্তু তারা এর কোন প্রতিষেধক খুঁজে পেল না। তারাও একে একে রোগাক্রান্ত মারা যেতে লাগল। এমতাবস্থায় তারা অমৃত ফলের কথা স্মরণ করে কান্নাকাটি করতে লাগলো। এভাবে কিছুকাল অতিক্রম হওয়ার পর হঠাৎ একদিন দ্বীপের সৈকতে অদ্ভুত ধরণের একটি বীজ দেখতে পেলে। কোথা থেকে বীজটি ভেসে এসেছে। তারা অমৃত ফলের বীজ মনে করে বীজটিকে স্বযত্নে তুলে নিয়ে আগের অমৃত বৃক্ষের পাশেই রোপন করল। এবার তাদের যত্ন দেখার মত। তারা পালাক্রমে বীজটিতে পানি দিতে থাকল। তারপর একদিন খুব সুন্দর ছোট্ট দুটি পাতা প্রস্ফুটিত করে বীজের অঙ্কুরোদ্গম হলো। তারপর ধীরে ধীরে মস্তক গগণমুখী করে বড় হতে থাকল বৃক্ষটি। তখন খুশিতে আপ্লুত দ্বীপবাসীর বৃক্ষের সেবায় দিবানিশি একাকার। তারা সর্বদা শঙ্কিত থাকে যে, বৃক্ষটি যেন পরিচর্চার অভাবে মারা না যায়। অবস্থা এমনই দাঁড়ায় যে, বৃক্ষ পূজারীদের নিজেদের অস্তিত্বের দিকে কোন খেয়ালই থাকে না।

যাই হোক। তাদের দিবানিশি পরিচর্যায় যথাসময়ে ঐ বৃক্ষের ডাল-পালা গজায়, প্রসার ঘটে। এক সময় বৃক্ষটি ফুলের সমারোহে ভরে ওঠে। তখন বৃক্ষ পূজারীরা বৃক্ষের সেবা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয় সেই অমৃত ফলের আশায়। সময় আসন্ন, তাই বৃক্ষ পূজারীদের ঘুম নাই, খাওয়া নাই, তারা শুধু অমৃতের স্বপ্নে দিনরাত পার করে দেয়। অবশেষে বৃক্ষে অমৃত ফলের দেখা পাওয়া যায়। সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। সবাই আনন্দোৎসবে ফল সংগ্রহ করে। এবার তারা বহুল প্রতীক্ষিত অমৃত নামক সেই ফল ভক্ষণ করলো। কিন্তু হায়! একি হলো? অমৃত ফল খেয়ে কারো চোখ নষ্ট হলো, কারো মস্তিষ্ক বিকার হয়ে গেল, কেউবা বধির হয়ে গেল, কারো স্মৃতিশক্তি লোপ পেল। অবস্থা দেখে তারা সবাই হতবিহ্বল হয়ে গেলো। তারা ভাবল তারা বোধহয় সঠিকভাবে বৃক্ষের সেবা করতে পারছে না। তাই বৃক্ষটি তাদের প্রতি নারাজ, তাই অমৃত ফল কোন কাজেই আসছে না। এবার তারা ক্ষমা চেয়ে পুনরায় বৃক্ষ সেবায় আত্মনিয়োগ করার। লক্ষ্য একটাই, অমৃত ফল তাদের চাইই চাই। তাদের সেবায় বৃক্ষটি আরো প্রসারিত হলো এবং সময় মত আবার ফুল-ফলে পূর্ণ হলো। এবারতো রীতিমত বৃক্ষের ফল হাতে পাওয়ার জন্য তুলকালাম। একজন অন্যজনকে হত্যা করতে দ্বিধা, সংকোচ করল না। তারপর যারা ফল ভক্ষণ করল, তাদের অবস্থা আগেরবারের চেয়ে আরো খারাপ হয়ে দেখা দিল– ফল খেয়ে কেউ পঙ্গু, কেউ হিংস্র, কেউ উদ্ধত, কেউ পশুর মত হয়ে গেলো। এমতাবস্থায়ও তাদের পণ্ডিতরা হাল ছাড়তে নারাজ- ভাবলো সঠিকভাবে পরিচর্যা করতে না পারায় তাদের এই খেসারত দিতে হচ্ছে, কিন্তু কিছু প্রাণহানী হলেও জাতীয় স্বার্থে তারা গাছের পরিচর্যা আরো বারিয়ে দিল। তার বুঝল না এটা বিষবৃক্ষ, এটা কখনো অমৃত ফল দিতে পারবে না।

এসলামে নেতা নির্বাচন পদ্ধতি

এস.এম.সামসুল হুদা

নেতৃত্বের আকাঙ্খাই প্রথম অযোগ্যতা

ভোটে জেতার জন্য দলের অন্যদের সাথে কলাকৌশল ও প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নিজের গুণগান গেয়ে আত্মপ্রকাশ করার এই পদ্ধতিতে কখনো যোগ্য লোক নেতৃত্ব আসতে পারে না।

অনেকে বলেন এসলামই গণতন্ত্র আবার অনেকে বলেন সমাজতন্ত্রের ধারণা এসলামই দিয়েছে, এসলামের নামে রাজতন্ত্র চোলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী, এখনও কোথাও কোথাও টিকে আছে এসলামী রাজতন্ত্র কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবটাই ভুল। একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। ধরুন আপনার চুল, আমার চুল প্রায় একই রকমের। আপনার কান, আমার কানও দেখতে প্রায় একই রকমের, আপনার চোখ দুইটা, আমারও দুইটা, আমার হাত-পা দুইটা কোরে, আপনারও দুইটা কোরে, আমি বাংলায় কথা বোলি আপনিও বাংলায় কথা বলেন। এভাবে আপনার আর আমার মধ্যে এমন বহু বিষয় মিল রোয়েছে, কিন্তু তাই বোলে আপনি আর আমি একই ব্যক্তি নই। আপনার আর আমার মধ্যে বেশ কিছু বিষয়ে খানিকটা মিল থাকলেও হাজারো লক্ষ বিষয় আছে যেটা একেবারে বিপরীত। যেমনঃ নাম, বংশ, মন, মেজাজ, চরিত্র, বয়স ইত্যাদি সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিক তেমনি এসলাম যেহেতু একটি স্বতন্ত্র জীবনব্যবস্থা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রও প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা জীবনব্যবস্থা, তাই এদের মধ্যে আবশ্যকীয় বিষয়গুলিতে কিছু কিছু মিল থাকতেই পারে। কিন্তু পার্থক্যও আছে অগণিত। সবচেয়ে বড় পার্থক্য হোচ্ছে এর সৃষ্টি ও সার্বভৌমত্বে। এসলাম তৈরি কোরেছেন আল্লাহ স্বয়ং, সুতরাং এটি তাঁর মতই নিখুঁত এবং অপরিবর্তনীয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য তন্ত্র-মন্ত্রগুলি মানুষের তৈরি, মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত, এগুলির সার্বভৌমত্বও মানুষের। সুতরাং মানুষের তৈরি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র ইত্যাদির কোনটার সঙ্গে এসলামের তুলনা করা আল্লাহর সঙ্গে চরম ধৃষ্টতা এবং মুর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। সারা দুনিয়াতে এখন গণতন্ত্রের জয়জয়কার। কথায় বলে, Might is right- শক্তিমানের কথাই ঠিক। তাই মোসলেম জনসংখ্যাও এখন হাসিমুখে গণতন্ত্রের জয়গান কোরে যাচ্ছে। আল্লাহর দীনের বিপরীত সবকিছুই কুফর, তাই এসলামের আলেম ওলামারা এসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের যোগসূত্র খুঁজে পেতে মহাব্যস্ত। এর মধ্যে যে দলগুলি এসলামের ব্যানার নিয়ে গণতন্ত্রের জোয়ারে গা ভাসিয়েছে তাদের মুখে কিছু বুলি আমরা প্রায়ই শুনতে পাই যেমন, 'নির্বাচনই এ সময়ের জেহাদ,' 'ব্যালটই হোচ্ছে বুলেট' ইত্যাদি। হীনমন্যতাবশতঃ এবং নিজেদের পক্ষে সাফাই হিসাবে তারা এসলামের সঙ্গে গণতন্ত্রের মিল অন্বেষণ কোরলেও প্রকৃতপক্ষে এসলামের নেতা নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে অন্য কোন তন্ত্রের নেতা নির্বাচন পদ্ধতির কোন মিল নেই। প্রতিটি জীবনব্যবস্থাতে, দীনে (System of life) নেতা নির্বাচনের পৃথক পদ্ধতি রোয়েছে। এসলামেও স্বভাবতই নেতা নির্বাচনের একটি ব্যবস্থা রোয়েছে। কালক্রমে এসলাম বিকৃত হয়ে যাওয়ায় সেই ব্যবস্থাটিও বিকৃত হয়ে গেছে। বর্তমানে আমরা দেখি কেবল ধর্মনিরপেক্ষ দলই নয়, অনেক এসলামপন্থী দলও প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই নেতা নির্বাচন কোরে থাকে। বর্তমানের এই পদ্ধতির ফলে কি ধরণের নেতৃত্ব কিভাবে নির্বাচিত হন সে বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক।

একটি পুকুরে যদি বড় বড় ফাঁকা বিশিষ্ট একটি জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়, তাহোলে সেই জালে কোন ছোটমাছ ধরা পড়বে না, ধরা পড়বে কেবল বড় মাছগুলি। ছোট মাছ ধরার বেলায় জালের ফাঁকাগুলি হোতে হয় খুব ছোট, যেমন কারেন্ট জাল। সুতরাং কোন ধরণের মাছ আমি ধোরব তার উপরে নির্ভর কোরবে আমার জাল কেমন হবে, অর্থাৎ এই জাল হোচ্ছে মাছ ধরার একটি System. বর্তমানে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন করা হয় সেটি হোচ্ছে বড় ফাঁকাবিশিষ্ট একটি জালের মত, অর্থাৎ বড় বড় রুই কাতলারাই এতে উঠে আসবে। সমাজে যারা প্রভাবশালী, বিত্তবান, পেশীশক্তিতে বলীয়ান তারাই এখন সমাজের রুই কাতলা। পক্ষান্তরে যারা চরিত্রবান, ভালো মানুষ, ওয়াদা

রক্ষাকারী, ভদ্র, সভ্য, কারও ক্ষতি করে না তারা বর্তমানের সমাজে বোকা হিসাবে চিহ্নিত, তারা গুরুত্বহীন, সর্বত্র অবদমিত। এই দুই ধরণের মানুষের সমন্বয়েই সমাজ। এই সমাজে প্রচলিত পদ্ধতির নির্বাচনে কেমন লোক নির্বাচিত হবে সেটা দেখা যাক।

প্রচলিত পদ্ধতির নির্বাচনে প্রথমে একজন টাকা দিয়ে মনোনয়ন পত্র কিনে প্রার্থী হয়, নিজের ছবি দিয়ে পোস্টার ছাপায়, নিজের গুণগান নিজেই প্রচার করে, মিছিল করে, ব্যানার টানায়, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়, মানুষকে তার পক্ষে নেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রলোভন দেখায়, প্রয়োজনে বহু হিংসাত্মক কাজে জড়িত হয় যেমন প্রতিপক্ষকে খুন করা, বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। গ্রাম্য মেম্বার থেকে শুরু কোরে যে কোন পর্যায়ের নির্বাচনেই এসব ঘটনা ঘোটে থাকে। এটাই নেতা নির্বাচনের বর্তমান সিস্টেম বা জাল, সারা দুনিয়াতে এই সিস্টেম প্রায় একই রকম, শুধু কোথাও সহিংসতা কম, কোথাও বেশী। এখন ধরুন একজন সৎ মানুষ আছেন যিনি বিত্তবান নন, নিজস্ব কোন লাঠিয়াল বাহিনী নেই, পেছনে প্রভাবশালী গোষ্ঠীর মদদ নেই, তিনি নির্বাচনে দাঁড়ালেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বড়ই দুঃশ্চরিত্র, নীতিহীন এবং অনেক টাকার মালিক। এখন এই নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কার? সহজ উত্তরঃ এই দ্বিতীয় লোকটাই বিজয়ী হবে। এভাবে প্রতিটি পর্যায় থেকে খারাপ লোকগুলি বিজয়ী হোতে হোতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসে। সুতরাং বড় ফাঁক বিশিষ্ট জাল দিয়ে যেমন সব ছোট মাছ বেরিয়ে যায় এবং বড় মাছগুলি রোয়ে যায়, তেমনি নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ, অসৎ চরিত্রের মানুষটিই বিজয়ী হয়ে নেতার আসনে উপবিষ্ট হন। আমরা বোলি না যে, যারা এই পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচিত হন তাদের ১০০% ই খারাপ লোক, কিছু কিছু সচ্চরিত্র লোকও এ পদ্ধতির জালে উঠে আসেন তবে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। আর আসলেও তারা বেশীদিন তাদের চরিত্র বজায় রাখতে পারেন না; System টাই এমনভাবে তৈরি যে, কেউ ভালো থাকতে চাইলেও ভালো থাকতে পারেন না, বিরুদ্ধ স্রোতে বেশীদিন নৌকা বাইতে পারেন না।

এবার এসলামে নেতৃত্ব মনোনয়নের পদ্ধতিটি দেখা যাক। রসুলাল্লাহ বলেছেন, তোমরা যখন কারো ভিতর নেতৃত্ব পাবার বাসনা, আকাঙ্খা দেখ সে যেন কখনও তোমাদের মধ্যে নেতা না হোতে পারে [আবু বুরাদা (রা:) থেকে বোখারী]। সুতরাং এটা হোচ্ছে প্রথম নীতি। এসলামের সভ্যতার সাথে বর্তমানের সিস্টেমের আসমান জমিন পার্থক্য, বলা যায় বিপরীত। এসলামের কথা হলো, কর্তৃপক্ষ যদি কোনপ্রকারে বোঝে যে কোনো এলাকার আমির (নেতা) হবার জন্য একজন লোকের মনে অভিপ্রায় আছে তাহোলে শুরুতেই সে অযোগ্য বোলে পরিগণিত হবে তাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতই যোগ্য মনে হোক না কেন। বর্তমানের পদ্ধতিতে অযোগ্যতা হোল কেউ আদালতে শাস্তি পেলে, ব্যাংকের ঋণখেলাপি হলে, বয়স কম হলে ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু এসলামে নেতৃত্ব পাবার অন্যান্য অযোগ্যতার পূর্বে প্রাথমিক অযোগ্যতা হল নেতৃত্ব পাবার লোভ, বাসনা। আল্লাহর রসুল তাঁর অন্তিম সময়ে মুতার প্রান্তরে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন যে বাহিনীর প্রধান হিসাবে তিনি মনোনীত করেন ১৭ বছর বয়সী ওসামা বিন যায়েদকে (রা:)। মোহাম্মদ বিন কাসেম ছিলেন সিন্ধু অভিযানের সেনাপতি। তখন তারও বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। সুতরাং এসলামে অল্প বয়সী হওয়াটা নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র অযোগ্যতা নয়। প্রথম অযোগ্যতায় হলো, "নেতা হবার কামনা"। এটা হোল উর্ধ্বতন নেতা কর্তৃক অধস্তন নেতা নিযুক্তির বেলায় নিয়ম।

কিন্তু সাধরণ ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন পদ্ধতি হোল- একটা গ্রামের আমীর নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুঁজে বের করতে হবে এমন ব্যক্তি কে যিনি সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু, মুত্তাকি, আমানতদার, সৎ, আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্ভীক, স্বজনপ্রীতি করে না। যার সামনে পাহাড় নড়বে কিন্তু তার ওয়াদা নড়বে না, কোটি টাকা তার ঘরে আমানত রাখলে সে ধরেও দেখে না টাকাগুলি নতুন না পুরানো। এমন লোকের খোঁজ নিতে হবে। বিস্তারিত খবর নেয়ার পরে তার নাম ঘোষণা করতে হবে। যার নাম ঘোষণা করা হবে সে হয়তো নিজেও জানবে না একটু পরে সে এই এলাকার আমির হবে। এই আমীররা আবার সবাই মিলে তাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকী ও উপরোক্ত সদগুণাবলী বিশিষ্ট লোকটিকে তাদের নেতা নির্বাচিত কোরবেন। এইভাবে পর্যায়ক্রমে আমীর নির্বাচিত হোতে হোতে একেবারে রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ ইমাম পর্যন্ত নেতা নির্বাচিত হবে। এ হলো এসলামী সভ্যতা। বর্তমানে যে নিয়মটি প্রচলিত আছে সেটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত কারণ বর্তমানে নেতা হোতে শুরুতেই প্রার্থী হোতে হয়। জমিতে আগাছার প্রাদুর্ভাবে যেমন ফসল বিনষ্ট হয়, তেমনি আজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র দুঃশ্চরিত্র, মিথ্যাবাদি, ষড়যন্ত্রকারী, পরসম্পদলোভী, দুর্নীতিগ্রস্ত লোকগুলি নেতার আসনে বসে থাকার কারণে ভালো লোক, নিরপেক্ষ, লোভ লালসার উর্ধ্বে এমন লোক প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে, থাকলেও তারা অস্তিত্বের সংকটে আছেন। অথচ আজ থেকে মাত্র কয়েক দশক আগেও আমাদের এই দেশে সৎ লোকেরা নিজে থেকেই সমাজের নেতৃত্ব ও সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসতেন অথবা মানুষজনই তাদেরকে একরকম জোর কোরে ধোরে অনেক সময় তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ কোরত। তারা সাধারণত সৎ, নির্ভীক, লোভ-লালসাহীন, অন্যের উপকার, মানবসেবা ইত্যাদিকে তারা ধর্মীয় কাজ ও নৈতিক দায়িত্ব বোলে মনে কোরতেন। ফলে দেখা যেত কোন অর্থকড়ি খরচ না কোরেই তারা নির্বাচিত হোতেন। অনেকে নির্বাচনে না জিতলেও নিজের পয়সায় সমাজ সেবা কোরে যেতেন। কিন্তু আজ দিন বদলেছে। এখন সমাজে এমন অর্থশালী মানুষ পাওয়া কঠিন যারা দেশের মানুষের উপকারের জন্য স্কুল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। যারা করেন তাদের অধিকাংশের উদ্দেশ্য থাকে কেবলই ব্যবসা। আর নেতারা এইকাজগুলি করেন সরকারের টাকায়, যদিও বরাদ্দ টাকার বেশীর ভাগই ভাগ বাটোয়ারা কোরে খায় রাঘব বোয়াল থেকে চুনোপুঁটির লম্বা লাইন।

এখন নেতারা সমাজ সেবার কাজ যা কিছু করে সব প্রশংসার জন্য। আজকে নেতারা জনগণের দেয়া করের টাকায় কোথাও একটা ব্রিজ তৈরি কোরে দেয়, একটা ছেলেকে যদি বৃত্তি, একজন বৃদ্ধকে কিছু টাকা দেয় সেটা নিয়েও তাদের প্রচারণার কোন শেষ থাকে না, সব অবদানের সঙ্গে নিজের নামটি অবধারিতভাবে জুড়ে দেয়। টিভি ক্যামেরা না আসলে ত্রাণ দেওয়া বন্ধ থাকে। এসলামী সভ্যতায় এটা হবে একেবারে বিপরীত। কোন প্রশংসা কেউ পাবেনা, প্রশংসা হবে শুধু আল্লাহর। যে কাজই হোক নেতা বলবে এটা জনগণের, এটা আল্লাহর। আমি কিছুই করি নাই, সব আল্লাহ কোরেছেন। মানুষের টাকা, মানুষের সম্পদ। আমি শুধু এর রক্ষক। কারও কোন নাম থাকবে না, কোন কিছুতে কারো নাম খোদাই করা থাকবে না। কারণ নেতা যা কোরেছে তা কোরেছে জনগণের টাকা দিয়ে, মোসলেমদের টাকা দিয়ে। কাজটা কোরেছেন আল্লাহ, সমস্ত তওফীক ও কৃতিত্ব আল্লাহর, সমস্ত পাওনা আল্লাহর। এর অসাধারণ নজির স্থাপন কোরেছেন এই জাতির নেতা স্বয়ং রসুলাল্লাহ। তিনি যখন মক্কা বিজয় কোরলেন অর্থাৎ তিনি মক্কার অধিপতি। মক্কা বিজয়ের পর আল্লাহর রসুল বোললেন, 'এই যে আজকে আমাদের বিজয়, অর্জন এটা আল্লাহ একা কোরেছেন।' এমনকি এও বোললেন না যে, আমরা চেষ্টা কোরেছি, যদিও এটা ইতিহাস যে তিনি ও তাঁর

সঙ্গীরা আপ্রাণ সংগ্রাম কোরেছিলেন। ঠিক তেমনি এসলামে কেউ কোন কিছু নিজে কোরেছে এরকম দাবি কেউ করবে না। এ দাবি যদি কেউ করে সাথে সাথে সে তার পদ হারাবে। এটা দাবি করা হলো ঐ পদে বহাল থাকার ক্ষেত্রে তার প্রথম অযোগ্যতা। একজন নেতার পক্ষে তার কোন সফলতার জন্য কৃতিত্ব দাবি করা তো দূরের কথা, অন্যের মনেও এই ধারণা যেন না থাকে সে বিষয়েও এসলামের দৃষ্টি কত সতর্ক তার জ্বলন্ত উদাহরণ খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা:) এর পদচ্যুতির ঘটনাটি। খালেদ (রা:) এর নেতৃত্বে উম্মতে মোহাম্মদী যখন একটির পর একটি যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী হোচ্ছিল তখন বাহিনী ও জনসাধারণের মনে একটি ধারণা জন্ম নিল যে খালেদ (রা:) এর যোগ্য নেতৃত্বের কারণেই এ বিজয় হোচ্ছে। যদিও খালেদ (রা:) কোনদিন এমন কথা বলেন নাই, তবুও আল্লাহর প্রতি নির্ভরতার এই ঘাটতিটুকুও খলিফা ওমর (রা:) মেনে নিলেন না। তিনি খালেদকে (রা:) সেনাপতির পদ থেকে একজন সাধারণ সৈন্যের কাতারে নামিয়ে দিলেন। পক্ষান্তরে বর্তমান ব্যবস্থায় প্রতিটি দেশের প্রতিটি সরকার ও প্রতিটি নেতার প্রধান একটি কাজই হোল তারা কি কি অবদান রেখেছেন, কি কি জনকল্যাণ ও উন্নয়ন কোরেছেন তা নিয়ে বাগাড়ম্বর করা। বর্তমানের দাজ্জালীয় 'সভ্যতা' আর প্রকৃত এসলামের সভ্যতার সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত।

হায়! কেমন কোরে আসবে সেই প্রকৃত এসলাম। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে এসলামের নামে যা চোলছে তার সঙ্গে যে আল্লাহর রসুলের এসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক যে সত্যদীন আল্লাহ রসুলাল্লাহকে অর্পণ কোরেছিলেন, যা রসুলাল্লাহ ও তাঁর উম্মাহ অর্ধেক পৃথিবীতে কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা কোরে মানবজাতিকে অতুলনীয় শান্তি ও নিরাপত্তার স্বর্ণযুগ উপহার দিয়েছিলেন, সেই প্রকৃত এসলাম গত ১৩০০ বছরের কালপরিক্রমায় বিকৃত হোতে হোতে বর্তমানে একেবারে বিপরীতমুখী হোয়ে গেছে। তথাকথিত আলেম শ্রেণি এই বিকৃত এসলামটিকে তাদের রুটি রুজির মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছেন। অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী আজ বহু ফেরকা, মাজহাব, মাসলা মাসায়েল ইত্যাদির কূটতর্ক নিয়ে, বহু আধ্যাত্মিক তরিকা, বহু রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি, হানাহানিতে লিপ্ত হোয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত হোয়ে আছে; তাদের একটি অংশ এসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড কোরে মানুষকে এসলামের বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ কোরে তুলেছে। জাতির বৃহত্তম অংশটি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জীবনে ঐ বিকৃত ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা কোরে যাচ্ছে। এর কোনটাই আল্লাহ, রসুলের প্রকৃত এসলাম নয়, কেননা এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি। অর্থাৎ যারা এসলামের অনুসারী হবে তারা শান্তিতে থাকবে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ঠিক এর বিপরীত। যারা এই অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খোঁজেন তাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ হোচ্ছে, সেই হারিয়ে যাওয়া প্রকৃত এসলাম মহান আল্লাহ আবার দয়া কোরে টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান এমামুয্‌যামান, The Leader of the Time জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর পক্ষ থেকে হেযবুত তওহীদ মানবজাতিকে বোলছে, "এই অশান্তিময় অবস্থা ও আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহকে জীবনের একমাত্র এলাহ, হুকুমদাতা হিসাবে মেনে নেওয়া ছাড়া আর বিকল্প নাই।"

হেযবুত তওহীদ সত্যের উপর অটল থাকবে এনশা'আল্লাহ

মসীহ উর রহমান, আমীর, হেযবুত তওহীদ

হেযবুত তওহীদ কোন মনগড়া মতবাদের উপর ভিত্তি কোরে কাজ কোরছে না। আল্লাহ ১৪০০ বছর আগে তাঁর শেষ রসুলকে যে মহাসত্য দান কোরেছেন সেই মহাসত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেই সত্যটি মানবজাতির সামনে তুলে ধোরেছেন এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। হেযবুত তওহীদ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর মনোনীত আন্দোলন, এর পরিচালনাও কোরছেন প্রকৃত পক্ষে মহান আল্লাহ। তাই হেযবুত তওহীদ কোনদিনই সত্যবিচ্যুত হবে না এনশা'আল্লাহ। হেযবুত তওহীদের অতীতের দিকে লক্ষ্য কোরলে দেখতে পাবেন, গত ১৮ বছর ধোরেই আমরা সত্যের উপর অবিচল আছি। সত্য হোচ্ছে ন্যায়, আর মিথ্যা হোচ্ছে অন্যায়। গত দেড় যুগে যামানার এমামের একজন অনুসারীও কোন অপরাধমূলক কাজ, কোন অন্যায় বা আইনভঙ্গ করে নি। আল্লাহর রসুল মক্কাবাসীর সামনে যখন তাঁর প্রতি নাজেলকৃত সত্যগুলি তুলে ধোরলেন, সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী এবং পুরোহিত শ্রেণী তাঁর সেই কথাগুলিকে ভালভাবে নেয় নি। তারা নবীর বিরুদ্ধে চালিয়েছে জঘন্য মিথ্যাচার, তাঁকে ও তাঁর অনুসারীদের উপরে চালিয়েছে কঠিন নির্যাতন। কারণ সত্য চিরকালই কায়েমী স্বার্থে আঘাত করে। ১৯৯৫ সনে যখন এমামুয্‌যামান সত্য এসলামটি বই লিখে সর্বসম্মুখে প্রকাশ কোরলেন, বিকৃত এসলামের ধ্বজাধারী মোল্লা পুরোহিত ধর্মজীবী আলেম শ্রেণি তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং ফতোয়াবাজি আরম্ভ করে। তাদের অপপ্রচারের কারণে এমামুয্‌যামানকে ১৯৯৮ সনে গ্রেফতার করা হয়। পরে ২০০৩ সনে তাঁকে আবারও গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হয়। সুতরাং এ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা থেকে শুরু কোরে এর সদস্যদের এমন কেউ নেই যাকে কোন না কোন নির্যাতন নিপীড়নের সম্মুখীন হোতে হয় নি। এই নির্যাতন এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে, বহু এলাকায় হেযবুত তওহীদের সদস্যদের বাড়িঘর পর্যন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে। লুটপাট কোরে বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ কোরে দেওয়ার ঘটনা যে কত ঘোটেছে তার কোন হিসাব নেই। বহু সদস্য সদস্যাকে নির্মমভাবে মারা হোয়েছে, আহত করা হোয়েছে, এমন কি দু'জনকে হত্যা পর্যন্ত কোরে ফেলা হোয়েছে। কেবল সন্দেহের বশবর্তী হোয়ে, মিথ্যাবাদী ষড়যন্ত্রকারীদের দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে এবং সন্দেহের বশবর্তী হোয়ে হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে ৪৩০ বারের মত গ্রেফতার করা হোয়েছে, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন নিপীড়ন করা হোয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত একটি মাত্র আইনভঙ্গেরও প্রমাণ মেলে নি। অর্থাৎ হেযবুত তওহীদের

সত্যনিষ্ঠা আদালতে প্রমাণিত। দীর্ঘ ১৮ বছরে একটিও অপরাধ না করার মত দাবি কোন অরাজনৈতিক-রাজনৈতিক দল তো দূরের কথা, কোন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও কোরতে পারবে না। কোন নির্যাতন নিপীড়নই আল্লাহর দয়ায় হেযবুত তওহীদকে সত্যপ্রকাশে একদিনের জন্যও বিরত কোরতে পারে নি, এবং পারবেও না কোনদিন এনশা'আল্লাহ। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ মোজাহেদারা তাদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় কোরবানী কোরে দাজ্জালের প্রবর্তিত জীবনব্যবস্থা বিলুপ্ত কোরে সকল প্রকার অন্যায় অবিচার ও সন্ত্রাসের হাত থেকে মানবজাতিকে উদ্ধারের শপথ নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হোয়েছে। "আল্লাহ ছাড়া কোন হুকুমদাতা নেই"- এই সত্যবাক্যকে ধারণ করার জন্য আমরা আমাদের পার্থিব সবকিছু আল্লাহর পায়ে সমর্পণ কোরেছি। আল্লাহ দয়া কোরে আমাদেরকে যামানার এমামের মাধ্যমে সঠিক পথ দেখালেন, আমরা বুঝতে পারলাম মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, প্রকৃত সফলতা কি? তাই অন্য কারও সঙ্গে যারা হেযবুত তওহীদকে মেলাবেন তাদের বিরাট ভুল হবে। যদিও অন্ধের কাছে সাদা আর কালোতে কোনো তফাত থাকে না, তবু অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান?

কড়াই থেকে চুলা কম উত্তপ্ত নয়

মানুষ শুধু দেহসর্বস্ব, বস্তুসর্বস্ব প্রাণী নয়, তার একটি আত্মাও আছে। মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে তাকে সৃষ্টি কোরেছেন। মানুষকে আল্লাহ এমনভাবে সৃষ্টি কোরেছেন যেন তারা একে অন্যের সাথে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস কোরতে পারে। এই সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করার জন্যই মানুষের একটি জীবনব্যবস্থা অপরিহার্য। এই জীবনব্যবস্থা আবার হোতে হবে শরীয়াহ ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ (Balanced)। এমন ভারসাম্যপূর্ণ, নিখুঁত, ত্রুটিমুক্ত জীবনব্যবস্থা আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেনও। এরপরও মানুষ তার জীবন চালানোর জন্য নিজের ইচ্ছা মতো জীবনব্যবস্থা রচনা কোরেছে, যা ভারসাম্যহীন, ত্রুটিযুক্ত। এই জীবনব্যবস্থাগুলি গত কয়েক শতাব্দী ধরে প্রয়োগ কোরে দেখা হোয়েছে, কিন্তু এগুলি মানুষকে নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, উন্নতি, প্রগতি, ঐক্য, শৃঙ্খলা-এক কথায় সুখ ও শান্তি দিতে ব্যর্থ হোয়েছে। আফ্রিকা থেকে শুরু কোরে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত মোসলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ সকল দেশে বহুদিন ধোরে চরম অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ কোরছে। ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন, আন্দোলন, ভাঙচুর, হরতাল, জ্বালাও-পোড়াও ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি হোচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই প্রায় একই দৃশ্য। আমাদের দেশেও প্রায় সারা বছর চলে সরকার আর বিরোধীদলের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পারস্পরিক দোষারোপ, সরকার পতনের আন্দোলন, হরতাল, ঘেরাও, বিক্ষোভ, জনগণের জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সাধন। পাঁচ বছর পর পর নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার হাতবদল ঘটে। নতুন দল ক্ষমতায় এসে আগের সরকারের মতই দুর্নীতি, লুটপাট, স্বজনপ্রীতি, চাঁদাবাজি, অর্থ-সম্পদ বিদেশে পাচার কোরতে থাকে। এভাবে একের পর এক সরকার পরিবর্তিত হয়, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে পরিবর্তন আসে না। চলমান এই রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখে দেখে মানুষ হতাশ। কিন্তু তাদের কাছে কোন উত্তম বিকল্প না থাকাতেই একবার কড়াই থেকে চুলায় লাফিয়ে পড়ছে, আবার বাঁচার জন্য লাফিয়ে কড়াইতে উঠছে।

এমন পরিস্থিতি থেকে মানবজাতির পরিত্রাণের জন্য মহান আল্লাহ একটি পথ প্রদান কোরেছেন। এ পথটি কতটুকু ফলপ্রসু তা বুঝতে হোলে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে এসলাম-পূর্ব আরবের দিকে। তখন আরবের লোকেরা বংশধারার ভিত্তিতে বিভিন্ন গোত্র-উপগোত্রে বিভক্ত ছিল। জীবন নিয়ন্ত্রিত হোত গোত্রপতিদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক। এই সব গোত্রগুলির মধ্যে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেঁধেই থাকতো, যা পুরুষানুক্রমে অব্যাহত থাকতো। তারা ছিল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে অবজ্ঞাত, ক্ষুধার্ত ও নিঃস্ব বেদুইন হিসাবে পরিচিত। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত এই মানুষগুলিই যখন আল্লাহর রসুলের আনীত জীবনব্যবস্থাটি নিজেদের জীবনে প্রয়োগ কোরল, তখন তারা হোয়ে গেল বিশ্বজয়ী একটি জাতি। প্রায় নিরক্ষর আরবদের থেকে এমন একটি জাতির উন্মেষ ঘোটল যারা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামরিক শক্তিতে সকল জাতির শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত হোল। পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন মানুষগুলোকে ভাই হোয়ে গেল। চুরি, ডাকাতি প্রায় বন্ধ হোয়ে গেল। অভাব, অনটন, দারিদ্র্য দূর হোয়ে সমাজে সমৃদ্ধি আসলো। আজ আমরা রসুলাল্লাহর যে সাহাবীদেরকে আদর্শ মানুষ হিসেবে জানি, তাঁরা এসলাম গ্রহণের আগেও কি এমনই ছিলেন? না। কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁরাই একেকজন অনুসরণযোগ্য মহামানবে পরিণত হোলেন। আজও আমরা তাদের নামের পরে বোলি 'রাদি আল্লাহু আনহুম' অর্থাৎ 'আল্লাহ তাঁর প্রতি রাজি, খুশি।

বর্তমানের প্রেক্ষাপটেও আমাদেরকে সকল সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে আল্লাহর দেওয়া সেই অপরূপ, নিখুঁত সিস্টেমটি। স্রষ্টার প্রদত্ত সেই সিস্টেমকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা কোরে মানবজাতি একদিকে যেমন চরম অন্যায় ও অশান্তির আগুনে পুড়ছে, অপরদিকে আল্লাহর দৃষ্টিতে কাফের ও মোশরেক হওয়ার ফলে পরকালেও অনন্তকাল জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে। **তাই মানবজাতির প্রতি আমাদের প্রস্তাব- আসুন, আমরা যদি সত্যিই শান্তিতে নিরাপত্তায় জীবনযাপন কোরতে চাই তাহোলে বার বার সরকার পাল্টানোর চিন্তা না কোরে চলমান সিস্টেমটাই পাল্টাই।** আল্লাহর দেওয়া সিস্টেমই পারে সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার ও অপরাধের দুয়ার বন্ধ কোরে দিতে। সেই জীবনব্যবস্থা বা সিস্টেম মহান আল্লাহ ১৪০০ বছর আগেই শেষ নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর উপর নাজেল কোরেছেন। সময়ের বিবর্তনে সেই সত্যদীনের প্রকৃত রূপটি পৃথিবী থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। সেই সত্যময় জীবনব্যবস্থার রূপ কেমন হবে সেটি আবার মহান আল্লাহ এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে দান কোরেছেন যেটি বাস্তবায়নের ফলে আজকের ঘুণে ধরা সমাজের অসৎ মানুষগুলিই একেকজন সোনার মানুষে পরিণত হবে এনশা'আল্লাহ। আসুন, আমাদের মধ্যে বিরাজমান সকল মতভেদ, বিবাদ, বিসম্বাদ, দলাদলি, হিংসা, কলহ, শত্রুতা, স্বার্থপরতা ইত্যাদির উর্ধ্বে উঠে একটা কথার ওপর ঐক্যবদ্ধ হই যে, আমরা আল্লাহর হুকুম ছাড়া অন্য কারও হুকুম মানবো না।

রাজা অষ্টম হেনরী

কিভাবে জন্ম হোল দাজ্জালের!

মাননীয় এমামুয্‌যামানের লেখা থেকে

১৫৩৭ সনে ইংল্যান্ডে রাষ্ট্রজীবন থেকে ধর্মকে বিতাড়িত কোরে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়, আর ধর্মকে সীমাবদ্ধ করা হয় ব্যক্তিজীবনের উপাসনা, আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে। কালক্রমে সেই ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা থেকে উৎসারিত জীবনব্যবস্থা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি সারা পৃথিবীতে বিস্তারলাভ করে। এর প্রভাবে বর্তমানের মানুষ হোয়ে পড়ে চরম বস্তুবাদী। আজ মানবজাতির সামষ্টিক জীবন পরিচালিত হোচ্ছে স্রষ্টার বিধান ও শিক্ষার প্রভাবমুক্ত একটি আত্মাহীন প্রযুক্তিনির্ভর 'সভ্যতা'-র দ্বারা যার জন্ম ইহুদি ও খ্রিস্টানদের থেকে, যার পরিচালকও ইহুদি ও খ্রিস্টান জাতি। এই সভ্যতাইকে আল্লাহর রসুল ১৪০০ বছর আগে দাজ্জাল বোলে অভিহিত কোরেছেন।

মানবজাতি আজ এমন একটি সভ্যতাকে নিজেদের জীবনে ধারণ কোরে আছে যার সঙ্গে স্রষ্টা, আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই। যেই আত্মাহীন, স্রষ্টাহীন বস্তুবাদী যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কোরে দিয়েছে, এখন শারীরিকভাবেও তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে। এই ভয়াবহ বিপদের কারণ যে বস্তুবাদী ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জাল, তার জন্ম কিভাবে হোল?

আল্লাহ তার সৃষ্ট প্রথম মানুষটি অর্থাৎ আদম থেকে শুরু কোরে মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত যুগে যুগে প্রতি জনপদে নবী পাঠিয়ে মানুষকে জীবন-বিধান অর্থাৎ দীন দান কোরেছেন। তাই আল্লাহ তার দেয়া জীবন-বিধানের নাম দিয়েছেন এসলাম অর্থাৎ শান্তি। মোহাম্মদের (দ:) আগে ঐ নবীরা (আ:) তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও জাতির জন্য বিধান নিয়ে এসেছেন। নবীদের মধ্যে দুটো পরিষ্কার ভাগ দেখা যায়। একটি ভাগ হলো যারা আইন-কানুন, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক বিধান ও দণ্ডবিধি নিয়ে এসেছেন, আরেকটি ভাগ হোল ঐগুলোর সঙ্গে যে আত্মার উন্নতির জন্য যেসব কর্মকাণ্ড দরকার তাও ঐ আইন-কানুনের সাথে ভারসাম্যযুক্ত হোয়ে এসেছে। নবী-রসুলগণ (আ:) যে দীন, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি নিয়ে এসেছিলেন নবী-রসুলরা (আ:) বিদায় নেয়ার পর মানুষ এবলিসের প্ররোচনায় সেগুলোকে দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে বিকৃত কোরে ফেলেছে আবার আল্লাহ নবী-রসুল পাঠিয়েছেন; এমনকি পূর্ববর্তী দীনগুলোর হর্তাকর্তা পুরোহিত শ্রেণিদের দীনের বিশ্লেষণ ও অতি বিশ্লেষণ করার ফলে আত্মার উন্নতি হারিয়ে গিয়ে ভারসাম্যহীন হোয়ে গিয়েছিলো সেই ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ নবী (আ:) পাঠালেন। যেমন বৈদিক ধর্মের বিকৃতি সংশোধন কোরে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে আল্লাহ পাঠালেন কৃষ্ণ (আ:), বুদ্ধ (আ:), যুধিষ্ঠির (আ:) এবং মহাবীর (আ:) কে ঠিক তেমনি মুসা (আ:) এর আনীত শরীয়াহর বিকৃতি সংশোধনের জন্য আল্লাহ বনী এসরাইল তথা ইহুদি জাতির মধ্যে পাঠালেন ঈসাকে (আ:)। বিশ্বনবীর (দ:) জন্মের পাঁচশত বছর আগে ইহুদি জাতির মধ্যে আসলেন ঈসা (আ:)। এর আগে যার মাধ্যমে আল্লাহ বনি এসরাইল তথা ইহুদি জাতির জন্য ভারসাম্যপূর্ণ দীন যার মধ্যে আইন-কানুন, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক বিধান ও দণ্ডবিধি অন্তর্ভুক্ত ছিল তা পাঠিয়েছিলেন তিনি ছিলেন মুসা (আ:)। মুসা (আ:) চলে যাওয়ার পর চিরাচরিতভাবে এর মধ্যে জন্ম নেয়া পণ্ডিত, পুরোহিত শ্রেণি যারা রাব্বাই, সান্দুসাই ও ফারেসি নামে পরিচিত ছিল তাদের বাড়াবাড়ি, দীনের খুঁটি-নাটি বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ, অতি-বিশ্লেষণ, চুলচেরা বিচার ও ফতোয়ার কারণে দীনের মানবিক দিক, আত্মার দিক মরে গিয়ে ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে গিয়েছিলো। ঐ বিকৃতি, ভারসাম্যহীনতাকে সংস্কার করতে আল্লাহ ঈসা (আ:) কে পাঠালেন। তিনি বুদ্ধ, কৃষ্ণ (আ:) এর মত আইন-কানুন বাদে আধ্যাত্মিক দিকটি পুনরুদ্ধার কোরে ভারসাম্য ফিরিয়ে

দৈনিক
দেশেরপত্র

আনতে এসেছিলেন। ঈসা (আ:) তাঁর জাতিদের বোললেন, "তোমরা অন্য জাতিগুলোর মধ্যে যেওনা এবং কোনো সামারিয়ান শহরে প্রবেশ করো না। শুধুমাত্র এসরাইলী বংশের মেষগুলোর কাছে যেতে থাকবে।" (New Testament.Matt.15:24) ঈসা (আ:) যখন তাঁর ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালনের প্রচার আরম্ভ কোরলেন অর্থাৎ বনী এসরাইলীদের ভারসাম্যে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু কোরলেন তখন সেইসব পুরোহিত শ্রেণি তাঁর বিরুদ্ধে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিন বছর অক্লান্ত চেষ্টা কোরে ঈসা (আ:) ব্যর্থ হলেন বনি এসরাইলের সত্যপথে আনতে। এই তিনবছরের প্রচেষ্টায় মাত্র ৭২ জন, মতান্তরে ১২০ জন ইহুদি তাঁর ওপর ঈমান এনে তাঁর দেখানো পথে চলতে শুরু করেন। এসরাইলীদের পণ্ডিতশ্রেণি, তাদের তখনকার প্রভু রোমানদের সাহায্য নিয়ে ঈসাকে (আ:) কে হত্যার চূড়ান্ত ব্যবস্থা কোরলো তখন আল্লাহ তাঁকে সশরীরে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর যে শিষ্য জুডাস ইসকারিডাস ঈসা (আ:) কে রোমান ও পুরোহিতদের হাতে ধরিয়ে দিতে রাজি হয়েছিল তার দেহ ও চেহারা অবিকল ঈসা (আ:) এর মত কোরে তাকে ক্রুশে উঠিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিলো।

এরপর পল নামে একজন ইহুদি ঈসা (আ:) এর ওপর ঈমান আনলেন। তিনি কি সত্যিই ঈমান এনেছিলেন না ঈসা (আ:) শিষ্যদের মধ্যে ঢুকে বিভ্রান্ত কোরে তাদেরকে ঈসা (আ:) এর শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশ্য ছিল তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

পল ঈসার (আঃ) শিষ্যদের মধ্যে ঢুকে যে কয়টি পরিবর্তনের চেষ্টা কোরলেন তার মধ্যে সর্বপ্রধানটি হোচ্ছে ঈসার (আঃ) শিক্ষাকে বনি এসরাইলীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এটাকে বাইরে অ-ইহুদিদের মধ্যে প্রচার করা ও তাদের ঈসার (আঃ) শিষ্যত্ব গ্রহণ কোরতে আহ্বান করা। অনেক অপচেষ্টার পর পল সাহাবাদের মত বদলাতে সমর্থ হোলেন। পলায়নকারী এ শিষ্যরা উপলব্ধি কোরলেন যে, বনি এসরাইলীদের মধ্যে ঈসার (আঃ) শিক্ষা প্রচার অসম্ভব। যেখানে ঈসা (আঃ) নিজে ব্যর্থ হোয়ে গেছেন সেখানে শিষ্যরা হতাশ হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এক পর্যায়ে তারা বাধ্য হলেন ঈসার (আঃ) নীতি বিসর্জন দিয়ে অ-ইহুদিদের মধ্যে তার আদর্শ প্রচার না কোরতে। ওরা ভুলে গেলেন ইহুদিদের বাইরে এই আদর্শ সম্পূর্ণ অচল।

পল ঈসার (আঃ) সঙ্গে থেকে সরাসরি তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি, তাঁর সাহচর্য পান নি। কাজেই ঈসার (আঃ) প্রকৃত শিক্ষা ও তাঁর মর্ম তিনি পান নি, অথচ ঈসা (আঃ) পৃথিবী থেকে চোলে যাবার বেশ পরে, যারা সর্বক্ষণ ঈসার (আঃ) সাহচর্যে থেকে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে সরাসরি শিক্ষা পেয়েছিলেন তাদের চেয়ে বড় প্রবক্তায় পরিণত হোয়ে দাঁড়ালেন এবং তিনি যে শিক্ষা প্রচার আরম্ভ কোরলেন তা ঈসার (আঃ) শিক্ষা থেকে শুধু বহু দূরে নয়, প্রধান প্রধান ব্যাপারে একেবারে বিপরীত। পলের হাতে পোড়ে সেটা এক নতুন ধর্মের রূপ নিয়েছে। বর্তমানে খ্রিস্টান ধর্মের অনেক পণ্ডিতরাই বোলছেন যে আমরা আজ যে খ্রিস্টধর্ম দেখি এটাকে খ্রিস্টধর্ম (Christianity) না বোলে পলিয় ধর্ম (Paulinity) বলা উচিত। যা হোক ঐসব কারণে ঈসার (আঃ) শিক্ষার ঐ বিকৃত রূপটাকে একটা নতুন নাম দেয়া দরকার হোয়ে পড়লো যার নাম দেয়া হোল খ্রিস্টধর্ম। পল কর্তৃক এই যে নতুন ধর্মটিকে ঈসার (আঃ) নামে সূত্রপাত করা হোল যে ঈসা (আঃ) তাঁর জীবনেও 'খ্রিস্টধর্ম' বোলে কোন ধর্মের নামই শোনেন নি।

এখন পল যখন ঐ ধর্মের একটা বিকৃত রূপ ইউরোপিয়ানদের সামনে উপস্থাপিত কোরে তা গ্রহণ কোরতে বোললেন তখন তারা দেখলো যে ঐ বিকৃত রূপটাও তাদের দেব-দেবী, ভূত-পেত্নী পূজার চেয়ে অনেক ভালো, অনেক উন্নত এবং এই 'ধর্ম' সম্পূর্ণ ইউরোপে গৃহীত হোল। পল ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের প্রচারে ইউরোপ এই একতরফা, ভারসাম্যহীন ধর্ম গ্রহণ কোরলো ও তা তাদের জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোরলো। কারণ পেছনে বোলে এসেছি যে, মানুষ কখনই সার্বভৌমত্ব নিজের হাতে নিয়ে আইন-কানুন তৈরি কোরে- সেই মোতাবেক সমষ্টিগত জীবন যাপনের চেষ্টা করে নি। ইউরোপে এই ধর্ম সার্বিকভাবে গৃহীত হবার পর এক বুনিয়াদী সমস্যা দেখা দিলো।

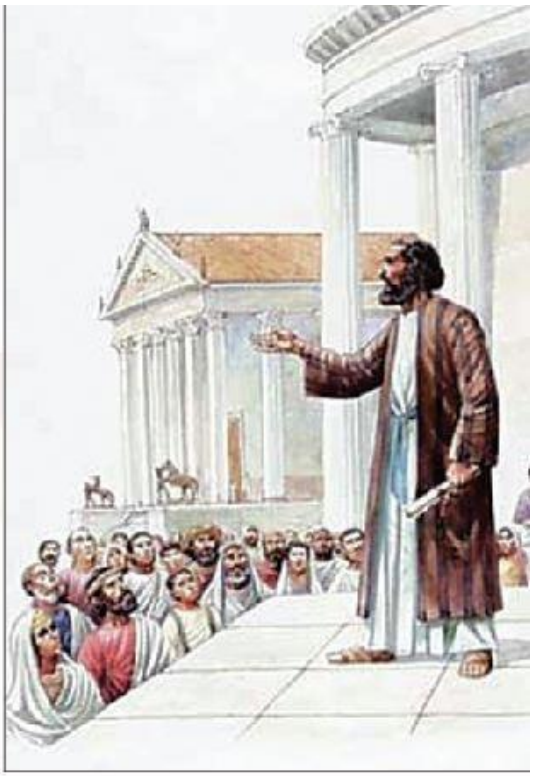

সেন্ট পল রোমে ধর্মপ্রচার কোরছেন

আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতিহীন একটি ব্যবস্থা দিয়ে একটি সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা অসম্ভব এটা সাধারণ জ্ঞান। অথচ পোপ ও ইউরোপীয় রাজারা সেই ব্যর্থ চেষ্টাই কোরলেন কারণ ধর্মীয় আদেশ-নিষেধ বাদ দিয়ে অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান কোরে নিজেরা সার্বভৌম হোয়ে নতুন সংবিধান, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি প্রণয়ন কোরে নেয়া তখনও মানুষের কাছে অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিলো। এই চেষ্টা কোরতে যেয়ে প্রতিপদে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনের ব্যাপারে সংঘাত আরম্ভ হোল এবং ক্রমশ তা এক প্রকট সমস্যারূপে দেখা দিলো। এই সংঘাতের দীর্ঘ ও বিস্তৃত বিবরণে না যেয়ে শুধু এটুকু বোললেই চোলবে যে এই সংঘাত এক সময়ে এমন পর্যায়ে যেয়ে পৌছালো যে ইউরোপীয় রাজা ও সমাজ নেতাদের সামনে দু'টো পথ খোলা রোইলো- হয় এই ধর্ম বা জীবন-ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ত্যাগ কোরতে হবে, আর নইলে এটাকে নির্বাসন দিতে হবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণ পরিধির সীমাবদ্ধতার মধ্যে, যেখান থেকে এটা রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কোন প্রভাব বিস্তার না কোরতে পারে। যেহেতু ধর্মকে মানুষের সার্বিক জীবন থেকে বিদায় দেয়া অর্থাৎ সমস্ত ইউরোপের মানুষকে নাস্তিক বানিয়ে দেয়া সম্ভব নয়, তাই শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্র ও সমাজ নেতারা দ্বিতীয় পথটাকে গ্রহণ কোরলেন এবং অষ্টম হেনরীর রাজত্বকালে ১৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে এই কাজ অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্মকে মানুষের সার্বিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোরে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হোল, দাজ্জালের জন্ম হোল।

এই পাশ্চাত্য ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতার জন্ম মানব ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। দাজ্জালের বয়স এখন ৪৭৬ বছর। সমস্ত পৃথিবী আজ চামড়া দিয়ে জড়ানো বস্তুর মতো ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতার করায়ত্ব হোয়ে গেছে। তার আত্মাহীন, স্রষ্টাহীন, নৈতিকতাহীন জীবনাদর্শ মেনে নিয়ে পৃথিবী আজ অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরাপত্তাহীনতা এককথায় সীমাহীন অশান্তির মধ্যে নিমজ্জিত। এভাবে দাজ্জাল আজ তার শয়তানী রূপের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি মাটিকে জাহান্নামে রূপ দিয়েছে।

[এই নিবন্ধটি লেখকের বিভিন্ন লেখা থেকে সম্পাদনা কোরেছেন মোহাম্মদ ইয়ামিন খান। শিক্ষার্থী, ইংরেজী বিভাগ, সরকারী রাজেন্দ্র কলেজ, ফরিদপুর।]

দুনিয়া ত্যাগ করা নয়
দুনিয়া সুন্দর করাই এসলাম
এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

দীন এবং দুনিয়া এই দুটি শব্দের সাথে আমরা সবাই কমবেশী পরিচিত। বিশেষ কোরে পরিচিত তাদের কাছে যারা মসজিদে যাতায়াত করেন তাদের কাছে, কারণ অধিকাংশ মসজিদেই লেখা থাকে, "মসজিদ এবাদতের জায়গা, এখানে দুনিয়ার কথা বলা নিষেধ" অথবা "মসজিদে দুনিয়ার কথা বলা হারাম"। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ কোরে যারা সওয়াবের আশায়, পরকালে জান্নাতের আশায় মসজিদে যান তাদের জন্য। এজন্যই দীন ও দুনিয়ার প্রকৃত অর্থ কি তা অবশ্যই আমাদের ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত বিকৃত এসলামে দীনের অর্থ করা হয় ধর্ম সেই অর্থে মসজিদ হোল শুধু ধর্ম, কর্মের জায়গা। আর এখন অবস্থা এমন হোয়ে দাঁড়িয়েছে যে মসজিদ শুধু নামায, জিকির, কোর'আন পাঠ করার জায়গা এখানে অন্য কিছু করা হারাম।

এই দীন, জীবন-ব্যবস্থা মানুষ যদি তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচার ব্যবস্থায়, পারিবারিক অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন জীবনে মেনে নেয় তাহোলে এই দুনিয়ার জীবনে শান্তিতে থাকবে, এসলামে থাকবে। দুনিয়ার জীবনে যে যদি শান্তিতে অর্থাৎ এসলামে থাকে তাহোলেই আল্লাহ পরকালীন জীবনে তাকে জান্নাত দিবেন। সুতরাং একজন মো'মেনের নিকট দীন ও দুনিয়া একই অর্থাৎ দুনিয়াই তার দীন।

প্রায়ান্ধত্বের কারণে, দৃষ্টির সংকীর্ণতার ফলে আকীদার, দীনের উদ্দেশ্যের সাংঘাতিক বিকৃতি এই দীনকে, এই দীনের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ধ্বংস কোরে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আকীদার, উদ্দেশ্যের এই বিকৃতি দীনকে শুধু ধ্বংসই করে নি, উদ্দেশ্যকেই উল্টো কোরে দিয়েছে। এই বিকৃতি দীনের শুধু ছোট ছোট ব্যাপার নয়, এর একেবারে মূল, বুনিয়াদী বিষয়গুলিকেও পাল্টে দিয়েছে। যে তওহীদের উপর শুধু এই শেষ দীন নয়, আদম (আ:) থেকে মোহাম্মদ (দ:) পর্যন্ত প্রতিটি দীন প্রতিষ্ঠিত, সেই তওহীদ পর্যন্ত আকীদার (Concept) বিকৃতির ফলে শুধু আংশিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ হোয়ে গেছে। অথচ আংশিক তওহীদ যে তওহীদই নয়, সেটা যে খাঁটি শেরক এবং সেই শেরকের মধ্যে বাস কোরে শুধু যে কোন এবাদতই যে আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে না তাই নয়, এই শেরক মাফ না করার জন্য আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সে উপলব্ধিই হারিয়ে গেছে এবং সারা দুনিয়াময় এই জাতি মহা সমারোহে নিস্ফল নামায, রোজা, হজ্জ যাকাত এবং আরও বহু নফল এবাদত কোরে যাচ্ছে। বুনিয়াদী বিষয়গুলি সম্বন্ধেই যেখানে আকীদা বিকৃত সেখানে ছোট ছোট বিষয়গুলি সম্বন্ধে তো কথাই নেই। এমনিভাবে কোর'আনের কতকগুলি শব্দের অর্থ পর্যন্ত আল্লাহ যে অর্থে ও উদ্দেশ্যে ব্যবহার কোরেছেন তা থেকে অন্য অর্থে ব্যবহৃত হোচ্ছে। মূল বিষয় সম্বন্ধে যখন ধারণা বিকৃত হয় তখন ঐ বিকৃতি ঐ সমগ্র বিষয়টির ছোট বড় সব কিছুকেই বিকৃত কোরে দেয়।

এমনি একটি শব্দ 'দুনিয়া'। কোর'আনে আল্লাহ 'দুনিয়া' শব্দটি যে অর্থে ব্যবহার কোরেছেন, মহানবী (দ:) যে অর্থে ব্যবহার কোরেছেন আজ সে অর্থে ব্যবহার হয় না। এই পরিবর্তন আরম্ভ হলো তখনই যখন এই দীনে ভারসাম্যহীন সুফীবাদ প্রবেশ করলো। সুফীবাদের সব কিছু শুধু আত্মার বিষয় নিয়ে অর্থাৎ ভারসাম্যহীন, পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তার রসূলের (দ:) শেখানো এসলাম হলো দীনে ওয়াসাত (কোর'আন- সূরা আল-বাকারা-১৪৩) দুনিয়া ও আখেরাতের, দেহের ও আত্মার, শরীয়াহ ও আধ্যাত্মিকতার এক বিস্ময়কর ভারসাম্যযুক্ত মিলন। সুতরাং এই দীনের যে কোন একটাকে এমন কি আংশিকভাবেও ছেড়ে দিলে এর ভারসাম্য নষ্ট হোয়ে যায়। পূর্ববর্তী 'ধর্ম'গুলির যে বিকৃত রূপ আজ পৃথিবীতে বর্তমান, সেগুলিতে শুধু আত্মার ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকটাই আছে। সুফীবাদ ঐগুলির মত আত্মার শুদ্ধির প্রক্রিয়াকেই একমাত্র কর্তব্য বোলে মনে করে, এবং এটা তাদের ধর্ম-কর্মের উদ্দেশ্য, আকীদা। ঐ বিকৃত 'ধর্ম'গুলির ও সুফীবাদের আত্মার উৎকর্ষ ও কেরামত করার শক্তি জন্মালেই হলো, বাকি পৃথিবীর মানুষ যত খুশী অন্যায়-অবিচার করুক, দুর্বলের উপর সবল যত পারে অত্যাচার করুক, মানুষে মানুষে যত রক্তপাত হোক অর্থাৎ সমস্ত দুনিয়ার সকল মানুষ যদি চূড়ান্ত অশান্তির মধ্যেও থাকে তাতে তাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু শেষ এসলাম এসেছে সমস্ত দুনিয়াময় শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা কোরতে, সকল মানুষকে শান্তি দিতে এবং তাও সংগ্রামের মাধ্যমে। যেখানে এই দুনিয়াতেই একটি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সেখানে সেই দুনিয়াকেই ত্যাগ বা তার গুরুত্ব কমিয়ে দেয়া কি কোরে সম্ভব হোতে পারে? আল্লাহ কোর'আনে মো'মেনদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই তিনি তাদের পৃথিবীর জমিন ও ক্ষমতা দান কোরবেন, যেমন তিনি পূর্ববর্তী মো'মেনদেরও দান কোরেছিলেন (কোর'আন- সূরা আন-নূর-৫৫)। মো'মেনদের যে তিনি পৃথিবীর উপর আধিপত্য, শক্তি দিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এ ব্যাপারে একটিমাত্র আয়াত উদ্ধৃত করা হোল, কোর'আনে এ প্রতিশ্রুতি অনেক বার আছে। পৃথিবীর জমিন ও ক্ষমতার সোজা অর্থ সে রাষ্ট্রীয় শক্তি ও আধিপত্য তা বুঝতে কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই। যে জাতির উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীর রাষ্ট্রশক্তি অধিকার কোরে আল্লাহর দেয়া আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করা- সে জাতির কাছে দুনিয়া শব্দের অর্থ এবং অন্যান্য বিকৃত ধর্ম ও সুফিবাদের কাছে দুনিয়া শব্দের অর্থ অবশ্যই একই অর্থ হোতে পারে না এ কথা সাধারণ জ্ঞানেই (Common Sense) বোঝা যায়। শেষ এসলামের উদ্দেশ্য ও বিকৃত ধর্মগুলির ও সুফীবাদের উদ্দেশ্য একেবারে বিপরীতমুখী। বর্তমানে এই উম্মাহ তার অস্তিত্বের অর্থ ও উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত দিকে চোলছে, তাই দুনিয়া শব্দের অর্থও তার কাছে পূর্ববর্তী অন্যান্য বিকৃত ধর্মগুলির মতই হোয়ে গেছে। কোর'আনে আল্লাহ ও হাদীসে তার রসূল (দ:) দুনিয়া শব্দ বোলতে অন্য অর্থ বোঝাচ্ছেন। সেটা

হলো এই- আল্লাহ ও তার রসুল (দঃ) এই জাতির, উম্মাহর জন্য যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির কোরে দিয়েছেন অর্থাৎ সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক দীন, দীনুল এসলাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে এই পৃথিবীতে, পার্থিব জীবনে যা কিছু বাধা হোয়ে দাঁড়াবে তাই দুনিয়া। আল্লাহ এই দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যান বা ত্যাগ কোরতে বলেন নি, যদি ত্যাগ কোরতে বোলতেন তাহোলে তিনি কখনই আমাদেরকে এই দোয়া কোরতে বোলতেন না যে, "হে আমাদের পালনকারী! আমাদের এই দুনিয়াকে সুন্দর কোরে দাও এবং আখেরাতকেও সুন্দর কোরে দাও" (কোর'আন- সূরা আল-বাকারা-২০১) শুধু তাই নয়, আল্লাহ আমাদের যে দোয়া শিখাচ্ছেন সেটাতে আখেরাত অর্থাৎ পরজীবনকে আগে বোলে দুনিয়া জীবনকে পরে বোলতে পারতেন। বলেন নি, আগে দুনিয়া তারপর আখেরাত বোলেছেন এবং সঠিক বোলেছেন। কারণ দুনিয়ার এই জীবন আমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্র, কর্মক্ষেত্র। এই জীবনেরই প্রতিফলন হবে আমাদের আখেরাত অর্থাৎ দুনিয়াতে আমরা যা কোরব তাই আখেরাতে পাব। কর্মক্ষেত্রই যদি আমাদের অসুন্দর হয়, ব্যর্থতাময় হয় তবে অবশ্যই আখেরাতও হবে অসুন্দর, ব্যর্থ। আজকের 'মুসলিম' দাবিদার এই জাতির ইহজীবন, দুনিয়ার জীবন যেমন অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, দারিদ্র্যে, ক্ষুধায় জর্জরিত, পরজীবনও হবে তেমনি কুৎসিত, ইহকালে যেমন অন্যান্য জাতির ঘৃণার, অবজ্ঞার পাত্র, পরকালেও হবে তেমনি ঘৃণার পাত্র, এই জীবনে যেমন অন্যের অনুকরণ, নকলকারী- ঐ জীবনেও দাঁড়াতে হবে তাদেরই সাথে। কাজেই আল্লাহ প্রথমে দুনিয়া বোলছেন। 'ধার্মিকরা' যে আকীদায় দুনিয়া দেখেন তাই যদি ঠিক হতো অর্থাৎ এ দুনিয়া কিছু নয় এর কোন দাম নেই, এটা অত্যন্ত ঘৃণ্য জিনিস, আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে বাধা, তবে দুনিয়াকে সুন্দর করার জন্য আল্লাহ দোয়া করতে নিশ্চয়ই বোলতেন না, বোলতেন দুনিয়া ত্যাগ করো। আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। দুনিয়া ও আখেরাতকে সুন্দর করার দোয়া শিখিয়ে তারপর আল্লাহ বোলছেন, "এবং আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।" অর্থাৎ যার দুনিয়া ও আখেরাত দুটোই সুন্দর, শুধু সেই রক্ষা পাবে আগুনের শাস্তি থেকে। আবার সেই ভারসাম্য, সেই পুলসেরাতের কথা এসে যাচ্ছে। পুলসেরাত যে পার হোতে পারবে না, যার ভারসাম্য নেই, সে পড়বে কোথায়? অবশ্যই আগুনে, কারণ পুলসেরাত জাহান্নামের উপর থাকবে।

সুতরাং সত্যনিষ্ঠ মো'মেনের নিকট দুনিয়া শব্দের অর্থ ও আকীদা হলো, সে এই পার্থিব জীবনকে যতটুকু সম্ভব সুন্দর কোরতে চেষ্টা কোরবে। এই পৃথিবীতে সে যত কাজ কোরবে তা যত সম্ভব সুন্দর কোরে, নিখুঁত কোরে কোরতে চেষ্টা কোরবে। ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি, যার যে পেশা, বৃত্তি, দায়িত্ব সেগুলোতে সে তার পক্ষে যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে কোরতে চেষ্টা কোরবে। এটা দুনিয়া নয় দীনদারী। বরং কেউ যদি তার পেশায়, দায়িত্বে গাফলতি করে, তার কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না করে তবে সেটাই হবে দুনিয়াদারী, গোনাহ। নবী করীম (দঃ) বোলেছেন- যখন এই দুনিয়ার কাজ কোরবে তখন এমনভাবে কোরবে যেন তুমি অমর, চিরঞ্জীব, আর যখন দীনের কাজ কোরবে তখন এমনভাবে কোরবে যেন তুমি পরের দিন মারা যাবে। আবার সেই ভারসাম্য, ওয়াসাত। যতক্ষণ একটা মানুষ অন্যকে না ঠকিয়ে, মিথ্যা না বোলে সততার সাথে তার পেশা কোরে যাবে, উপার্জন কোরবে ততক্ষণ সে এবাদত কোরছে, দীনের কাজ কোরছে। আর যে মুহূর্তে সে কোন কাজে মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় নেবে সেই মুহূর্তে সে দুনিয়ায় পতিত হবে। একদিন ফজরের নামাযের পর মহানবী (দঃ) মসজিদে বসা ছিলেন, এমন সময় দেখা গেলো এক যুবক রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ কোরে বাজারের দিকে যাচ্ছে। একজন সাহাবা (রাঃ) বোললেন- যুবকটা দুনিয়ার কাজে যাচ্ছে, কত না ভালো হতো যদি সে এখানে এসে বসতো। এ কথা শুনে রসুলাল্লাহ (দঃ) প্রতিবাদ কোরে বোললেন- যদি সে তার পরিবার পোষণের জন্য হালাল উপার্জনের জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাজারের দিকে যেয়ে থাকে তবে তার প্রতি পদক্ষেপে সওয়াব লেখা হোচ্ছে। লক্ষ্য কোরুন মহানবী (দঃ) হালাল উপার্জন উল্লেখ কোরলেন। যদি সে ঐ ব্যবসা-বাণিজ্য বা যে কোন পেশায় মিথ্যার আশ্রয় নেয় তবে আর তা এবাদত রোইল না, দুনিয়া হোয়ে গেলো। ঐ হালাল উপার্জন দিয়ে ভালোভাবে থাকায়, ভালোভাবে খাওয়া-পরায় এসলামে বাধা নেই, কোন নিষেধ নেই। কিন্তু ঐ উপার্জন ঐ সম্পদ যদি তাকে আল্লাহর রাস্তায় কোন কাজ থেকে বিরত করে, দীনের কাজে ব্যয় করা থেকে বিরত করে তখন তা দুনিয়া। শুধু সম্পদ নয়, এই পৃথিবীর যা কিছু আল্লাহর রাস্তায় বাধা হবে তাই দুনিয়া। সেটা সম্পদ হোক, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন হোক, যাই হোক। ঐ দুনিয়াকে আল্লাহ রসুল (দঃ) ত্যাগ কোরতে বোলেছেন। শুধু যে ভালোভাবে থাকা, ভালো খাওয়া-পরা তাই নয়, সাজ-সজ্জা, আড়ম্বর, জাঁক-জমক পর্যন্ত আল্লাহ মুসলিমদের নিষিদ্ধ করেন নাই। যিনত শব্দের অর্থ হলো সাজ-সজ্জা, জাঁক-জমক, আড়ম্বর ইত্যাদি। আল্লাহ তার রসুলকে বোলছেন- বলো, আল্লাহ তাঁর উপাসকদের, আবেদদের (মানবজাতি) জন্য যে সাজ-সজ্জা, জাঁক-জমক দান কোরেছেন, এবং যে হালাল ও পবিত্র সম্পদ (জীবিকা) দান কোরছেন, তা কে নিষিদ্ধ করলো? (আরও) বলো- ঐগুলি (সাজ-সজ্জা, জাঁক-জমক, আড়ম্বর ইত্যাদি) এই পৃথিবীর জীবনের জন্য (সবার জন্য) এবং কেয়ামতের দিনে শুধু মো'মেনদের জন্য (কোর'আন- সূরা আল-আ'রাফ-৩২)। আবার ঐ যিনাত সম্বন্ধেই অন্য সূরায় বোলছেন- জেনে রাখ, এই পৃথিবীর জীবন আমোদ-প্রমোদ, জাঁক-জমক, দম্ভ ও সম্পদ, সন্তান বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কি (কোর'আন- সূরা আল-হাদীদ-২০)? আপাতঃ দৃষ্টিতে দু'রকমের কথা মনে হয়। কিন্তু আসলে দু'রকমের নয়। আল্লাহ বৈরাগ্য নিষিদ্ধ কোরেছেন তাই পার্থিবভাবে উন্নত জীবন-যাপন, এমন কি আড়ম্বর, জাঁকজমকও নিষিদ্ধ করেন নি। কিন্তু জেনে রাখতে হবে এবং সর্বদা মনে রাখতে হবে যে আসলে এগুলি মূল্যহীন, আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর রসূলের দীনের কাজে ওগুলি বিনা দ্বিধায় কোরবানী কোরতে হবে। প্রয়োজনের সময় যদি ওগুলি ত্যাগ, কোরবানী না করা যায় তবেই তা দুনিয়া হোয়ে গেলো।

আপাতঃ দৃষ্টিতে এমনি পরস্পর বিরোধী কথা বোলেছেন রসুলাল্লাহ (দঃ)। বোলেছেন- 'এসলামে বৈরাগ্য নেই', এসলামের বৈরাগ্য-সন্ন্যাস হোচ্ছে জেহাদ ও হজ্ব। মুসলিম যখন জেহাদে যায় তখন অবশ্যই তার ঘর-বাড়ি, সম্পদ, স্ত্রী-পুত্র, পরিজন, সংসার ছেড়ে যায় অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করে। শুধু এই একমাত্র সন্ন্যাসই এসলাম অনুমতি দেয়, শুধু অনুমতি নয় উৎসাহিত করে। অন্য যে সন্ন্যাসটি হাদীসে পাচ্ছি অর্থাৎ হজ্ব, ওটা এক সময়ে সন্ন্যাসই ছিলো, কারণ তখনকার দিনে দূরদেশ থেকে হজ্বে গেলে বাড়ি ফিরে আসার নিশ্চয়তা ছিল না। বর্তমানে হজ্ব আর সে রকম পূর্ণভাবে সন্ন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না। মুসলিম যখন জেহাদে যায় তখন সে আর ফিরে আসার আশা করে না, কারণ তার সামনে তখন লক্ষ্য হয় এই জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান শাহাদাত। বিশ্বনবী (দঃ) নিজ হাতে যে জাতি সৃষ্টি কোরেছিলেন, নিজে যাদের শিক্ষা-ট্রেনিং দিয়েছিলেন সেই সম্পূর্ণ জাতিটিই ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সন্ন্যাসীর জাতি হোয়ে গিয়েছিলো। অন্যান্য

ধর্মের ও বর্তমানের সুফীদের সন্ন্যাসের সঙ্গে ঐ উম্মাহর সন্ন্যাসের তফাৎ হলো এই যে- এরা নিজেদের ব্যক্তিগত আত্মার উন্নতির জন্য বৈরাগ্য-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, আর এই উম্মাহর সন্ন্যাসীরা সমস্ত মানব জাতির কল্যাণ ও শান্তির জন্য সংসার ত্যাগ কোরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এরা সন্ন্যাস গ্রহণ কোরে তসবিহ, বদনা, জপমালা, কমণ্ডলু হাতে সংসার ত্যাগ করেন বা হুজরায় ঢুকেন আর উম্মতে মোহাম্মদী অস্ত্র হাতে সংসার ত্যাগ করেন। আল্লাহ-রসুল (দঃ) সন্ন্যাসকে নিষিদ্ধ কোরে দিলেন, অথচ দুটো ফরদ কাজ জেহাদ ও হজ্জকে সন্ন্যাস আখ্যা দিলেন। ঘোর পরস্পর বিরোধী মনে হোচ্ছে, তাই নয় কি? যিনিই এই দীনের মর্মবাণী বুঝবেন তার কাছেই আর বিরোধী মনে হবে না, তার কাছে সম্পূরক। আজ 'মুসলিম' জাতির কাছে 'দুনিয়া' শব্দের অর্থ আর অন্যান্য বিকৃত ধর্মগুলির সংসার শব্দের অর্থ একই অর্থ। প্রকৃত মুসলিমের আকীদায় দুনিয়া হলো- যা তাকে সমস্ত পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হোয়ে দাঁড়াবে- সেটা যাই হোক, সম্পদই হোক, স্ত্রী-পুত্র-পরিজনই হোক, এমন কি নিজের প্রাণের মায়াই হোক সেটা। ঐ বাধা না হোলে পৃথিবীর সব কিছু সে ভোগ কোরবে। আরও একভাবে প্রচলিত সন্ন্যাস ও এসলামের সন্ন্যাসে প্রকট তফাৎ রোয়েছে। প্রচলিত বৈরাগ্য স্বার্থপর; নিজের আত্মার উন্নতির জন্য।

কাজেই সংসারের ঝামেলা ত্যাগ কোরলেও নিজের প্রাণ উৎসর্গ কোরতে রাজী নয়, কারণ প্রাণ গেলে তো আর উন্নতির প্রশ্ন থাকে না। আর এসলামের বৈরাগ্য-সন্ন্যাস অন্যের জন্য, সমস্ত মানব জাতির জন্য, আল্লাহর জন্য এবং শুধু সংসার নয় নিজের প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ কোরে। কাজেই ঐ দুনিয়া ত্যাগ নিষিদ্ধ, পরকালে এর কোন পুরস্কার নেই, আর এসলামের বৈরাগ্য ফরদ এবং পরকালে এমন পুরস্কার ও সম্মান রয়েছে যে তার কাছাকাছিও অন্য পুরস্কার নেই, অন্য সম্মান নেই।

কোর'আনে দুনিয়া শব্দের অর্থ বিকৃত অর্থে নেওয়ার ফল হোয়েছে এই যে, বর্তমানের 'মুসলিম' নামক এই জাতির একটা অংশ অত্যন্ত 'পরহেযগার' হোয়ে গেছেন। কাজে-কর্মে 'এবাদতে' তারা সংসার বিমুখ, শিক্ষিত ও ধনী হওয়া সত্ত্বেও তারা প্যান্ট না পরে টাখনুর উপর পাজামা পরেন, লম্বা দাড়ী রাখেন, গোঁফ নেই, হাতে তসবিহ নিয়ে পাঁচবার মসজিদে দৌড়ান। এদের মধ্যে অনেক লক্ষপতি, কোটিপতি আছেন। এই দুনিয়া বিমুখ অতি মুসলিমদের কাছে যেয়ে যদি বলেন যে সমস্ত পৃথিবীতে আজ আল্লাহর হুকুম চোলছে না, আল্লাহর বিধান চোলছে না। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর বিধান, হুকুম প্রতিষ্ঠা কোরতে হবে, দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কোরতে হবে। আল্লাহ বোলছেন তিনি মো'মেনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন (কোর'আন- সূরা আত-তওবা-১১১, সূরা আন-নিসা-৭৪)। "আমরা আপনার জান চাচ্ছি না, আপনার লাখ লাখ টাকা আছে, তা থেকে আমাদের মাত্র এক লাখ টাকা দান কোরুন, আমরা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কোরব"। বোলে দেখেন ঐ দুনিয়া বিমুখ পরহেযগার অতি মুসলিম আপনাদের কত টাকা দান করেন। খুব সম্ভব তিনি আপনাদের দশ/বিশ টাকা দিয়ে রেহাই পেতে চেষ্টা কোরবেন। তার ঐ দুনিয়া বিমুখতার কোন দাম আল্লাহর কাছে নেই কারণ আল্লাহ এ দুনিয়া বিমুখতার অনুমতি দেন নি। আল্লাহ যে দুনিয়াকে ত্যাগ কোরতে বোলেছেন- অর্থাৎ এই দীনের প্রয়োজনে নিজের প্রাণসহ সব কিছু কোরবান করা- সেইখানেই তিনি ব্যর্থ। তিনি আসলে পরিপূর্ণভাবে দুনিয়াতে ডুবে আছেন। কোর'আনে আল্লাহ 'দুনিয়া' বোলতে কী বোঝাচ্ছেন সেটা রসুলাল্লাহ (দঃ) তার সাহাবাদের যা বুঝিয়েছিলেন সেইটা ঠিক, নাকি চৌদ্দশ' বছর পর এখন আমাদের 'ধর্মীয়' নেতারা যেটা বোঝাচ্ছেন সেইটা ঠিক? যারা সরাসরি মহানবীর (দঃ) সম্মুখে থেকে এসলাম শিক্ষা কোরেছিলেন তাদের একজনের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ওবায়দা (রাঃ) মিশরের খ্রীস্টান শাসক আর্চ বিশপকে বোলেছিলেন-"আমরা বেঁচেই আছি শুধু আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য (অর্থাৎ পৃথিবীতে এই জীবনব্যবস্থা-দীন মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য)। আমাদের শুধু পেটের ক্ষুধা নিবারণ আর পরার কাপড়ের চেয়ে বেশী কিছু চাই না। এই দুনিয়ার জীবনের কোন দাম আমাদের কাছে নেই- এর পরের জীবনই (আখেরাত) আমাদের কাছে সব।" দুনিয়া ও আখেরাত সম্বন্ধে এই ধারণা (আকীদা) শুধু ওবায়দারই (রাঃ) ছিলো না, প্রত্যেকটি সাহাবারই ছিলো, কারণ তারা সবাই ঐ আকীদা শিক্ষা কোরেছিলেন স্বয়ং বিশ্ব নবীর (দঃ) কাছ থেকে। তাদের একজনও তাসবিহ হাতে নিয়ে খানকায়, হুজরায় পলায়ন করেন নি। তাদের শিক্ষক (দঃ) তাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন- "এসলামে দুনিয়া ত্যাগ নেই, এসলামের বৈরাগ্য হোচ্ছে জেহাদ আর হজ্জ"। সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হোয়ে সমস্ত জাতি এসলামের সন্ন্যাস গ্রহণ করলো, হাতে নিলো তসবিহ নয় তলোয়ার, চোললো খানকার পানে নয় বিরাট পৃথিবীর পানে, আজকের ঠিক বিপরীত।

মানুষের কাজকে আজ প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হোয়েছে, একটি দুনিয়ার কাজ অর্থাৎ এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন যেমন- চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ইত্যাদি এগুলোর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক রাখা হোচ্ছে না। অন্যটি ধর্মীয় কাজ, পরকালের জন্য কাজ, যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, জিকির-আসকার ইত্যাদি এবং অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন উপাসনা। এগুলোর সাথে আবার দুনিয়ার কোন সম্পর্ক নাই। যারা পরকালকে বিশ্বাস করে না তারা এই ধর্মের বিষয়টি তাদের জীবন থেকে একেবারে বিদায় কোরে দিয়েছেন।

প্রকৃতপক্ষে দীন ও দুনিয়া এইভাবে মানুষের জীবনকে, কাজকে দুই ভাগে করার কোন সুযোগ নাই। কারণ এসলাম নামক এই জীবনব্যবস্থাটাই আল্লাহ দিয়েছেন এই দুনিয়ার জন্য, এই দুনিয়ার শান্তির জন্য। মানুষ যেন ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ সমস্ত রকম অন্যায়, অত্যাচার, জুলুম, রক্তপাত ইত্যাদি থেকে বেঁচে শান্তিতে থাকতে পারে এজন্য আল্লাহ মানুষকে এসলাম নামক এই দীন দিয়েছেন। এই দীন, জীবনব্যবস্থা মানুষ যদি তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিচারব্যবস্থায়, পারিবারিক অর্থাৎ সর্বাঙ্গীন জীবনে মেনে নেয় তাহোলে এই দুনিয়ার জীবনে শান্তিতে থাকবে, এসলামে থাকবে। দুনিয়ার জীবনে যে যদি শান্তিতে অর্থাৎ এসলামে থাকে তাহোলেই আল্লাহ পরকালীন জীবনে তাকে জান্নাত দিবেন। সুতরাং একজন মো'মেনের নিকট দীন ও দুনিয়া একই অর্থাৎ দুনিয়াই তার দীন।

বর্তমানে একটি অতি ক্ষুদ্র দল পৃথিবীর রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, দণ্ডবিধি, শিক্ষা, সংস্কৃতি এক কথায় জীবনের সমস্তকিছু দাজ্জালের উপরে ছেড়ে দিয়ে নিজেরা তাদের ভাষায় দুনিয়া ত্যাগ কোরে পরকালের অন্বেষণ কোরছেন। কিন্তু তাদের এই ধারণা ভুল, কারণ ওগুলি বাদ দিয়ে পরকালের সফলতা পাওয়া যাবে না, কেননা আল্লাহর শেষ জীবনব্যবস্থা ঐ ব্যবস্থাগুলি দিয়ে পূর্ণ। অপরদিকে মানবজাতির প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আখেরাত, পরকাল, আধ্যাত্মিকতা সবকিছু বিসর্জন দিয়ে পার্থিব ভোগ বিলাস ও প্রতিষ্ঠার পেছনে একমুখী হোয়ে ছুটছে। এটাই হোচ্ছে সেই দুনিয়া যা মানুষকে জাহান্নামের পথে নিয়ে যায়।

জনগণ কী চায় আর কী পায়?

জনগণ যা চায় না:

১. বোমা, ককটেলের বিস্ফোরণে আতঙ্কিত হয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি কোরতে চায় না।

২. গাড়ি ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ আর সশস্ত্র মিছিল ও বোমাবাজির মাঝে পড়ে প্রাণ হারাতে চায় না।

৩. চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজী ইত্যাদির কবলে পড়ে কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ হারাতে চায় না।

৪. হরতাল, অবরোধ আর মানববন্ধনের নামে অরাজকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা চায় না।

৫. কেউ অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদের পাহাড়ে বসে সীমাহীন ভোগবিলাসিতায় মত্ত থাকবে আর কেউ দারিদ্র্যের কবলে পড়ে ধুকে ধুকে মরবে এটা জনগণ চায় না।

৬. জোরপূর্বক শ্রম আদায় তথা দাসত্ব, মালিক-শ্রমিক সংঘর্ষ ইত্যাদি চায় না ।

৭. সুদ, ঘুষ, দুর্নীতি, চোরাকারবারি ইত্যাদি অসাধু কর্মকাণ্ড চায় না।

৮. হিংসা, হানাহানি, রক্তপাত, ভাইয়ে ভাইয়ে দলাদলি ইত্যাদি জনগণ চায় না।

৯. অনৈক্য, বিভেদ, বিশৃঙ্খলা চায় না।

১০. বিচারের নামে প্রহসন, বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা, আর বিচারের জন্য ঘাটে ঘাটে অর্থ ব্যয় কোরে নিঃস্ব হতে চায় না ।

১১. শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, শিক্ষকের অমর্যাদা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলাদলি চায় না ।

১২. নারী নির্যাতন, ইভটিজিং, ধর্ষণ, নারীদের অবমূল্যায়ন চায় না।

১৩. একদিকে কূপমণ্ডূক ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়ার কবলে পড়ে নারীদের বাক্সবন্দীকরণ অপরদিকে পাশ্চাত্য প্রভুদের অন্ধ অনুকরণে নারীদের অশ্লীল দেহ প্রদর্শন-এর কোনটাই চায় না ।

১৪. অশ্লীল অপসংস্কৃতির আগ্রাসনে দেশীয় সংস্কৃতির বিলুপ্তি চায় না।

১৬. গণমাধ্যমের সীমাহীন মিথ্যাচার, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মানুষের চরিত্র হরণ, শক্তিমানের চাটুকারবৃত্তি ইত্যাদি চায় না।

১৭. আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে প্রকৃত দোষীদের পরিবর্তে নিরপরাধ সাধারণ জনগণের উপর বর্বর অমানুষিক নির্যাতন, অপরদিকে প্রকৃত অপরাধীদের মদদ দিয়ে আর্থিক লাভবান হওয়ার সংস্কৃতি জনগণ চায় না।

১৮. কর্মসংস্থানের অভাবে যে বেকারত্ব, ক্ষুধা, দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় তা চায় না।

১৯. ঋণের দায়ে কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে চায় না।

২০. সর্বপরি মানবরচিত যে সিস্টেম মেনে নেওয়ার ফলে জীবনের প্রতিটা অঙ্গনে নেমে আসে দুঃখ, কষ্ট আর সীমাহীন অশান্তি; জনগণ আর এই সিস্টেম চায় না।

জনগণ যা চায়:

১. জনগণ দুর্নীতি ও অপরাধ মুক্ত রাষ্ট্র চায়।

২. শাসকদের জবাবদিহিতা চায়।

৩. সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চায়।

৪. জীবনের মৌলিক অধিকার পূরণের নিশ্চয়তা চায়।

৫. সর্বক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছলতা চায়।

৬. কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা চায়।

৭. গোলামী বা দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়।

৮. ঘাম শুকানোর আগেই শ্রমের ন্যায্য মূল্য চায়।

৯. সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন চায়।

১০. যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্য সম্মান চায়।

১১. পৃথিবীব্যাপী অবাধ বিচরণের অধিকার চায়।

১২. দূষণমুক্ত পরিবেশ চায়।

১৩. ফরমালিন ও সর্বপ্রকার বিষমুক্ত খাদ্যের নিশ্চয়তা চায়।

১৪. যানজটমুক্ত যোগাযোগব্যবস্থা চায়।

১৫. দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে এমন জীবনব্যবস্থা চায় যেটা তার বৈষয়িক চাহিদাও পূরণ কোরবে এবং আত্মার খোরাকও যোগাবে।

আধুনিক গণতন্ত্রের জনক আবরাহাম লিঙ্কন বলেছেন- Democracy is the government of the people, by the people & for the people. তার সংজ্ঞানুসারে বলা হয়ে থাকে গণতান্ত্রিক সমাজে নাকি জনগণের চাওয়ারই প্রতিফলন ঘটে। তবে আজ বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্রের এ কোন রূপ দেখছি? এই জীবনব্যবস্থায় জনগণ যা চায় না তা-ই পাচ্ছে আর জনগণের চাওয়া জমা হোচ্ছে স্বপ্নের মনিকোঠায়। তাহলে গণতন্ত্র নামের যে বিষ বড়ি জনগণকে গেলানো হোল তাদের অধিকার রক্ষার কথা বলে, তাদের চাওয়া-পাওয়ারই প্রতিফলন ঘোটবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোল তার কোনটাই তো দিতে পারে নাই তথাকথিত গণতন্ত্র। আসল কথা হোল মানুষের সকল সুন্দর ও যৌক্তিক চাওয়াই পূরণ কোরতে পারে একমাত্র আল্লাহর দেওয়া সিস্টেম। এই সিস্টেম বাদে পৃথিবীতে কোনদিনই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। কাজেই যে জীবনব্যবস্থা প্রয়োগ হোলে জনগণ যেটা চায় না সেটাই চোলতে থাকে সেই জীবনব্যবস্থা গণতন্ত্র হোক আর যে তন্ত্রই হোক তা চোলতে পারে না। জনগণের নামে চালিয়ে দেওয়া সকল তন্ত্র-মন্ত্র ছুড়ে ফেলে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দেওয়া প্রকৃত এসলাম গ্রহণ করার এখনই সময়। আর সেই প্রকৃত এসলামের দিকেই ডাকছে হেযবুত তওহীদ।

অন্যায়রোধে উপদেশ যথেষ্ট নয় এটা রাষ্ট্রশক্তির কাজ

যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র লেখা থেকে

আজকের পৃথিবীতে শত শত নয়, হাজারে হাজারে প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো নানাভাবে মানুষকে অন্যায় থেকে, পাপ থেকে বিরত রাখতে, পূণ্য কাজ বা সওয়াবের কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ব্যস্ত আছে। এই রকমের প্রতিষ্ঠান এসলাম, খ্রীস্ট, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি পৃথিবীর সব ধর্মেরই আছে। এরা সাধ্যমতো চেষ্টাও কোরে চলেছে মানুষকে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে ন্যায় ও পূণ্যে ফিরিয়ে আনতে। পারছে কি? না, দশ বিশ বছর আগের পৃথিবীর অন্যায় অপরাধের অবস্থার সঙ্গে একটা পরিসংখ্যান তুলনা কোরলেই পরিষ্কার হোয়ে যাবে যে ঐসব মহৎ প্রচেষ্টা মানব জাতিকে সমষ্টিগতভাবে উন্নত কোরতে পারে নি, তাদের অন্যায়, অপরাধের সংখ্যা কমাতে পারে নি বরং তা বহু বেড়ে গেছে। দশ বিশ বছর আগের তুলনায় শুধু যে পৃথিবীময় অন্যায়, অপরাধ (চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ধর্ষণ, ছিনতাই, খুন জখম ইত্যাদি) দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে তাই নয়, ঐসব মহতি প্রতিষ্ঠানগুলির অবিশ্রান্ত প্রচার সত্ত্বেও মানব জাতি আজ পারমাণবিক আত্মহত্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, আর মাত্র একটি পদক্ষেপ বাকি। কেন ঐসব মহতি প্রতিষ্ঠানগুলির চেষ্টার কোন ফল হোচ্ছে না? যদিও ঐ কাজ কোরতে বহু কোটি টাকা প্রতি বছর খরচ হোচ্ছে? তার কারণ শুধু শিক্ষা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে মানুষকে শৃঙ্খলায় আনা যাবে না, যদি শিক্ষা উপদেশের পর তা ভঙ্গ কোরে অপরাধ কোরলে কঠিন, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না থাকে বা না দেয়া যায়। বর্তমান মোসলেম দুনিয়াতেও অনেক প্রতিষ্ঠান, আনজুমান, জামাত ইত্যাদি আছে যেগুলো মোসলেমদের আরও ভালো 'মোসলেম' বানাবার জন্য প্রচার সভা-সমিতি এজতেমা ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি কোরে কোটি কোটি টাকা খরচ করেন, বহু পরিশ্রম করেন। এরা পণ্ডশ্রম করেন। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি বহু বছর থেকেই এই কাজ কোরছে, ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলির যে সংখ্যা ছিলো এবং যতলোক এগুলোতে শামিল ছিলো আজ তার চেয়ে অনেক বেশী আছে। কিন্তু একটি পরিসংখ্যান নিয়ে দেখুন ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে জনসংখ্যার অনুপাতে বিভিন্ন দেশে শতকরা যতভাগ চুরি, ডাকাতি, খুন, ব্যভিচার ইত্যাদি হতো আজ তার চেয়ে অনেক বেশী হোচ্ছে। একটি বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠান আছে যেটার উদ্দেশ্য হোচ্ছে এসলাম ধর্ম প্রচার ও শিক্ষা দেয়া। বিভিন্ন দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ঐ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থেকে ঐ কাজ করেন। এরা জোর দিয়ে প্রকাশ করেন যে তাদের প্রতিষ্ঠান নিছক 'ধর্মীয়' সুতরাং অরাজনৈতিক। একটি 'মোসলেম' প্রধান দেশে এরা বছরে একবার একত্রিত হন। বলা হয় এদের এই সমাবেশে হজ্বের চেয়েও বেশী লোক হয়। যেখানে ঐ বাৎসরিক সম্মেলন হয় ঐ দেশটাকেই ধরুন উদাহরণ স্বরূপ। ত্রিশ-চল্লিশ বছর আগে ঐ দেশটাতে জনসংখ্যার অনুপাতে যে অপরাধ হতো আজ তার চেয়ে বহুগুণ বেশী অপরাধ ঘটছে। শুধু তাই নয় তখন যত রকমের অপরাধ ঘোটতো আজ তার চেয়ে অনেক বেশী নতুন নতুন ধরনের অপরাধ যোগ হোয়েছে। তাহোলে কোটি কোটি টাকা ব্যয় কোরে হজ্বের পর পৃথিবীর বৃহত্তম 'মোসলেম' সম্মেলন কোরে, এত পরিশ্রম কোরে লাভটা কী হলো? সত্যিকার এসলামের কথা না হয় এখানে বাদই রাখলাম অন্যান্য ধর্মও যেটুকু কোরতে চেষ্টা করে, অর্থাৎ মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে অন্যায় অপরাধ থেকে বিরত রাখা, সেটুকুও তো তারা কোরতে ব্যর্থ হোয়েছেন। মসজিদ থেকে জুতা চুরিটুকুও তো তারা বন্ধ কোরতে পারেন নি, বরং জুতা চুরি চল্লিশ বছর আগের চেয়ে আজ অনেক বেশী। শুধু তাই নয়, এখন মসজিদের দরজা ভেঙ্গে মাইক, ফ্যান, ঘড়িও চুরি হোয়ে যায়। আগেই বোলেছি পণ্ডশ্রম, কিছুই হবে না। এই জন্য হবে না যে, অপরাধ কোরলে তার শাস্তি দেবার শক্তি না থাকলে শুধু ওয়াজ-নসিহত কোরে মানুষকে অপরাধ থেকে ফেরানো যাবে না এবং ঐ শাস্তি দেয়ার ক্ষমতা রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। কাজেই রাষ্ট্রীয়ভাবে এসলাম প্রতিষ্ঠিত না হোলে সে এসলাম পূর্ণ এসলাম নয়, সেটা হবে আংশিক, কাজেই ব্যর্থ হবে এবং আংশিক এসলাম আল্লাহ গ্রহণ করেন না, কারণ তা শেরক। সামাজিক জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপারেও এসলামের নীতি বর্তমানের এসলামের নীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেখানে শেষ নবী (দ:) প্রবর্তিত শেষ এসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে সেখানে

আজ মসজিদও নিরাপদ নয়। তাই জুতা চুরি হওয়ার ভয়ে সেজদার সামনে নোংরা জুতা রেখে সালাতের দৃশ্য আমাদের কাছে অস্বাভাবিক মনে হয় না। অথচ ১৪০০ বছর আগে অর্ধ-পৃথিবীতে আল্লাহর দীন এমন পরিবেশ সৃষ্টি কোরেছিল যখন সালাতের সময় মানুষ সোনার দোকান খোলা রেখে মসজিদে যেত।

সামাজিক পর্যায়ে এয়াতীমখানা, আনজুমানে মফিদুল এসলাম, পঙ্গু-আবাস, প্রতিবন্ধী-আবাস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন হবে না, কারণ, এ সমস্ত দায়িত্ব রাষ্ট্রের। তাই মহানবী (দঃ) ঐ ধরনের কোন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন নি। যে এয়াতীমদের সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাঁর কোর'আনে বহুবার উল্লেখ কোরেছেন; যে এয়াতীমদের সম্বন্ধে বিশ্বনবী (দঃ) এতবার বোলেছেন; সেই এয়াতীমদের জন্য একটি এয়াতীমখানা তিনি প্রতিষ্ঠা কোরতে পারতেন না? যে বিস্ময়কর মহাকর্মী পৃথিবীতে একটা মহাশক্তি সৃষ্টি কোরলেন তাঁর সামান্য একটি নির্দেশেই তো শত শত এয়াতীমখানা প্রতিষ্ঠিত হোয়ে যেতো। তিনি তা করেন নি, তা তার সুন্নাহ নয়, কারণ তিনি জানতেন যে, যে রাষ্ট্র তিনি প্রতিষ্ঠা কোরে গেলেন, যে জীবনব্যবস্থা তিনি চালু কোরে গেলেন তা যদি মানুষ তাদের জীবনে চালু রাখে, বিকৃত না করে তবে ঐ সব জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন হবে না, রাষ্ট্রই সে দায়িত্ব নেবে।

আজ 'মোসলেমদের' আকীদায় রাষ্ট্রের কোন স্থান নেই। 'ধর্ম' বোলতে তাদের আকীদা ও খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু ইত্যাদির আকীদার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তাদের মতই এদের 'ধর্ম' ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ এসলাম, মহানবী (দঃ) প্রবর্তিত এসলাম নয়। তাঁর শেখানো এসলাম প্রথমেই আরবের বুকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন। তারপর তার চলে যাবার পর সে এসলাম দুর্বার সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে অর্ধেক দুনিয়ার রাষ্ট্রশক্তি অধিকার কোরেছিলো, এটা সর্বসম্মত ইতিহাস। ঐ সময়ে ঐ এসলামে অন্য কোন মাযহাব ছিলো না, কোন ফেরকা ছিলো না, মসলা-মাসায়েল নিয়ে কোন মতভেদ ছিলো না, কোন পীর মুরীদ ছিলো না, খানকাহ, হুজরা, ছিলো না, মসলা মাসায়েল বিশ্লেষণকারী পুরোহিত যাজকশ্রেণি ছিলো না। ছিলো শুধুমাত্র দীনুল কাইয়্যেমা, সনাতন ধর্ম, সেরাতুল মোস্তাকীম। অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, সালাত ও যাকাত, এবং ঐ দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীমকে সমস্ত পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা কোরে মানব জাতির জীবনের প্রতি স্তরে শান্তি আনয়ন করার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম, জেহাদ। আর আজ ঐ দীনুল কাইয়্যেমার, সেরাতুল মোস্তাকীমের, সংবিধানের চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা আছে, বহু মযহাব বহু ফেরকায় বিভক্তি আছে, মসলা-মাসায়েল নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি আছে, যাজক শ্রেণি আছে, বহু রকম তরিকা আছে, বহু রকম পীর-মুরীদ আছে, খানকাহ আছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসলাম নেই, ওখানে আল্লাহর ওয়াহ্‌দানীয়াত নেই এবং তা করার জেহাদও নেই। সুতরাং এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ঐ দুই এসলাম একেবারে ভিন্ন জিনিস, একটা অপরটার বিপরীতমুখী। যেহেতু মহানবীর (দঃ) প্রবর্তিত এসলাম এবং বর্তমানের এসলাম ভিন্ন, সুতরাং ঐ ভিন্ন এসলামের উৎপাদিত জাতিগুলিও সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বিপরীতমুখী। আল্লাহর রসুলের (দঃ) এসলাম সৃষ্টি কোরেছিলো এক অজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি, আজকের এসলাম সৃষ্টি করে কাপুরুষ-ভীতু, যারা যুদ্ধের-সংগ্রামের কাছ দিয়েও যায় না। মহানবীর (দঃ) এসলাম সৃষ্টি কোরেছিলো এক সিংহের জাতি, দীনের সামান্যতম বিপদে হুংকার দিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, আজকের এসলাম সৃষ্টি করে খরগোশ, বিপদের আভাস পাওয়া মাত্র যেগুলি পাগড়ীর লেজ হাওয়ায় উড়িয়ে তীব্রবেগে গর্তের ভেতর লুকায়। বিশ্বনবীর (দঃ) এসলাম যে মোসলেম সৃষ্টি কোরেছিলো তা সুদূর সিন্ধু দেশে একটি মোসলেম মেয়ের অপমানিত হবার খবর পেয়ে সেখানে মুজাহীদ বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছিলো, আজকের এসলাম যে 'মোসলেম' সৃষ্টি করে তা কয়েক মাইল দূরে তাদের মতই 'মোসলেম'দের হত্যা করা হোচ্ছে খবর পেয়ে নির্বিকারভাবে ওযু কোরে টাখনুর উপর পাজামা পড়ে মাথায় টুপি দিয়ে হাতে তসবিহ নিয়ে মসজিদে যায়। আল্লাহর রসুল (দঃ) তাঁর নবীজীবনের সংগ্রামের অতি প্রাথমিক সময়ে বোলেছিলেন "শীগগিরই সময় আসছে, যখন একা একটি অলংকার পরিহিতা যুবতী সানা থেকে হাদ্রামাউত পর্যন্ত (কয়েকশ' মাইল) নির্ভয়ে চলাফেরা কোরতে পারবে।" অর্থাৎ ঐ রকম নিরাপত্তা সৃষ্টি করা রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ইতিহাস এই যে কিছুদিন পরই তার (দঃ) প্রবর্তিত এসলাম আরবের বুকে আল্লাহ'র তওহীদ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কোরে তার ভবিষ্যতবাণীর নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা কোরেছিলো যদিও তখন ঐ এসলামের মোসলেম সংখ্যায় ছিলো মাত্র দু'তিন লাখ। আর আজকের এসলাম যে 'মোসলেম' উৎপাদন করে তারা বিশ-ত্রিশ লাখ একত্র হোয়ে এজতেমা করে। তাদের চারিদিকে চলে হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ঘুষ, ছিনতাই। ত্রিশ-চল্লিশ লাখ একত্রিত হোয়ে হজ্ব করে আর দুনিয়াময় তাদেরই উপর চলে নির্মম নির্যাতন, যুদ্ধ, রক্তপাত, দেশ থেকে উচ্ছেদ-করণ তবুও তারা টু শব্দটি করার সাহস পায় না। এই সব হাজ্বীদের রাষ্ট্রগুলি শাসিত হয় সেই আইন-কানুন দিয়ে যেগুলো ধ্বংস কোরে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা কোরতে বিশ্বনবী (দঃ) প্রেরিত হোয়েছিলেন। বিশ্বনবীর (দঃ) প্রবর্তিত এসলাম যে মোসলেম উৎপাদন কোরেছিলো সে মোসলেমের আকীদা এই ছিলো যে, তাদের নেতা আল্লাহর রসুলের (দঃ) জীবনের উদ্দেশ্য ছিলো সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে শেষ এসলাম সমস্ত মানব জাতির উপর কায়েম কোরে পৃথিবীময় শান্তি প্রতিষ্ঠা, আর আজ যে এসলাম প্রচলিত তা যে মোসলেম উৎপাদন করে তাদের আকীদা হলো এই যে আল্লাহর নবী রসুলদের নেতা, তার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যার কোন তুলনা নেই তাকে পাঠানো হোয়েছিলো মানুষকে টাখনুর উপর পাজামা পড়ার মত, মাথায় টুপি দেবার মত, দাঁত মাজার মত, কুলুখ নেয়ার মত, ডান পাশে শোয়ার মত তুচ্ছ ব্যাপার শেখাতে। মানুষের ইতিহাসে বোধহয় কোন জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন করে নি। কাহ্‌হার (শাস্তিদানে কঠোর) আল্লাহও তার শ্রেষ্ঠ ও প্রিয়তম রসুলের (দঃ) এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ছাড়েন নি। তিনি ইউরোপীয়ান খ্রিস্টান জাতিগুলি দিয়ে এদের লাইন কোরে দাঁড় কোরিয়ে মেশিনগান দিয়ে গুলি করিয়েছেন, বেয়নেট কোরে, জীবন্ত কবর দিয়ে, পুড়িয়ে, ট্যাংকের তলায় পিষে মেরেছেন, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশুরাও বাদ যায় নি। এদের মেয়েদের ইউরোপের আফ্রিকার বেশ্যালয়ে বিক্রি করিয়েছেন এবং তারপর মাত্র চারটি ছোট দেশ বাদে মরক্কো, থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত এই বিশাল এলাকার সমস্তটুকুর রাষ্ট্রশক্তি এদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ইউরোপীয়ান খ্রিস্টান জাতিগুলির হাতে দিয়ে দিয়েছেন এবং তারা এদের সর্বস্ব লুণ্ঠণ ও শোষণ কোরে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নামিয়ে দিয়েছে, গৃহপালিত পশুর মত এদের নিজেদের কাজে লাগিয়েছে, তাদের জুতা পরিষ্কার কোরিয়েছে।

পৃথিবীর রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে কিছুদিন আগে এই তথাকথিত মোসলেম নামের এই জাতি ইউরোপের দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু মুক্তি তারা দিয়ে গেলেও এরা মুক্তি নেয়নি। এখনও স্বেচ্ছায় তাদের পূর্ব প্রভুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার দাসত্ব কোরছে। আর যারা মহা মোসলেম তারা সেই আগের মতই ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, যিনি মানব জাতির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তাকে টুপি, পাগড়ী, আর দাড়ি-মোচের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোরে তার চরম অপমান কোরে চলেছেন। এরা যদি আজও সেই পৃথিবী কাঁপানো ব্যক্তিত্বকে তাদের নিজেদের মতো গর্তের ভেতরে লুকানো মেরুদণ্ডহীন খরগোশ মনে কোরে তার অপমান কোরতে থাকেন তবে এরপর আল্লাহর শাস্তি হবে আরো কঠিন, তার প্রতিশোধ হবে আরও ভয়াবহ।

কাজেই শুরুতেই যে কথা বোলতে চেয়েছি তা হলো শুধু ওয়াজ নসিহত কোরে, উপদেশ বিতরণ কোরে, বাণী শুনিয়ে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি দূর করা যাবে না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব-ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন কোরে সেই রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই কেবল সকল অবিচার দূর করা সম্ভব। উপদেশবাণী, নীতিকথা শুনে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু ভালো মানুষ তৈরি হোলেও সমষ্টির চাপে, বৃহত্তর শক্তির চাপে ব্যক্তিগতভাবে আর ভালো থাকা যায় না। কাজেই এসলাম ব্যক্তিগত নয়, জাতীয় ও সামষ্টিক। শুধু আইন প্রয়োগ কোরে, শরীয়াহ প্রয়োগ কোরে যেমন শান্তি আনা যায় না ঠিক তেমনই শুধু আধ্যাত্মিক শিক্ষা, নসিহত কোরে, শান্তি আনা যায় না। দুটোই দরকার। এটাই ভারসাম্য, ওয়াসাতা; একদিক শরীয়াহ'র দণ্ডবিধি অন্যদিকে আল্লাহর ভয়ে অন্যায় না করার আত্মিক প্রশিক্ষণ।

দৈনিক
দেশেরপত্র
মানবতার কল্যাণে সত্যের প্রকাশ

জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই 'দাসত্ব'

প্রকৃত এসলাম জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থা বিলুপ্ত কোরেছে আর ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' তথা দাজ্জাল এর বিশ্বায়ন কোরেছে

কোন মানুষই স্বনির্ভর নয়:

মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের মৌলিক পার্থক্য হোল তার, তার মধ্যে আল্লাহর রূহ আছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সৃষ্টিগতভাবে তাকে এভাবে তৈরী করা হোয়েছে যে, সে কখনোই স্বনির্ভর নয়, কোন না কোনভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ অভাবী। আল্লাহ তায়ালা হোচ্ছেন একমাত্র সামাদ অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী। মানুষ একা একা চোলতেই পারবে না। তাকে চোলতে হবে সমাজবদ্ধভাবে। একটি সমাজের সব মানুষ এক রকম নয়, তাদের শারীরিক যোগ্যতা, মেধা, দক্ষতার ক্ষেত্র, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি, মন-মানসিকতায় প্রচুর বিভিন্নতা রোয়েছে। এটি মহান আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। এটা যদি না থাকতো তাহোলে, ভালো এবং মন্দের কোন পার্থক্য থাকতো না, ন্যায় অন্যায়ের কোন পার্থক্য থাকতো না সর্বপরি সমাজে কোন ভারসাম্য থাকতো না। আল্লাহ বলেন, "তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর মর্যাদা (ফজল) দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন (সূরা আন'আম : আয়াত ১৬৫)।

সুতরাং অনাদিকাল থেকেই মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন যাপন করছে। আর সেখান থেকেই উৎপত্তি হোয়েছে সেবা দান বা গ্রহণের বিষয়টি। যিনি সেবা গ্রহণ কোরবেন সেটি তার জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনি যিনি সেবা প্রদান করবেন তার জন্যও দরকার। স্রষ্টার এ এক অনন্য কৌশল! এই সেবা দেয়া বা নেয়া প্রধানত দুই ভাবে হোতে পারে। একটা হোল স্বেচ্ছায় বা স্বপ্রনোদিত ভাবে, আরেকটি হোল অনিচ্ছায় বা বাধ্য হোয়ে। সেবা প্রদানের পেছনে বস্তুগত যে কারণ থাকে তা হোল কর্মসংস্থান, অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকা। দরিদ্র মানুষগুলি অবস্থাসম্পন্ন মানুষদের আনুগত্যে সমর্পিত হয় মূলত এ কারণেই, কিন্তু যখন এই আনুগত্য ও কাজ কোরে দেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মার সংযোগ ঘটে, তখন এই সাহায্য সহযোগিতাগুলিই কর্তব্যবোধ, মানবতাবোধ, ভালোবাসা থেকে উৎসারিত হয়ে এবাদতে পর্যবসিত হয়। অনাদি কাল থেকে মানুষ প্রধানত দুটি কারণে অন্যের সেবা কোরে আসছে - প্রথমত তার প্রয়োজনে এবং দ্বিতীয়টি স্রষ্টার সন্তুষ্টির আশায় এবং দায়িত্ববোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ, কর্তব্যবোধ অর্থাৎ আত্মার তাগিদ থেকে। প্রথম প্রকারের সেবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। আর দ্বিতীয় প্রকারের সেবা সে কোরে এসেছে দায়বদ্ধতা ও কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে। যেমন বাবা মাকে সন্তানদের সেবা। সন্তান মনে করে সে তার মা বাবার প্রতি দায়বদ্ধ। তাই বাবা-মায়ের সেবা কোরে তাদের সেই ঋণ শোধ করার চেষ্টা কোরতে হবে, এতে বাবা মা খুশি হবেন, তাদের আশীর্বাদে আল্লাহ সন্তানের জীবন বরকতমণ্ডিত করবেন। বাবা-মা সন্তানকে তিলে তিলে বড় কোরে তোলেন, যখন তাঁরা বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন সর্বদিকে দুর্বল হোয়ে পড়েন, সে সময় সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হোল বাবা-মায়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান, সেবা ও সহযোগিতা করা। এটা মানব জাতির একটা চলমান প্রক্রিয়া। মানুষ কেবল যে তার বাবা-মায়ের কাছেই ঋণী তা নয়, সে তার জীবনে বহু বিষয়ের জন্য বহুজনের কাছে ঋণের জালে আবদ্ধ থাকে। যেমন শিক্ষাগুরু, যার কাছে মানুষ আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক শিক্ষা নিয়ে থাকে তাকে সেবা করা মানবসমাজের একটি চিরন্তন বিষয় ছিল যা এখন প্রায় বিলীয়মান। আত্মিক দায়বদ্ধতা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা থেকে মানুষ মানুষকে এমন সেবা কোরেছে যা মহত্ত্ব ও উচ্চতায় কখনও কখনও আকাশকেও ছাড়িয়ে গেছে। সেবা কোরতে গিয়ে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার অসংখ্য উদাহরণও সবার জানা আছে কিন্তু সেগুলি বর্তমানে কেবলই ইতিহাস।

সেবা ও দাসত্ব:

জাগতিক প্রয়োজন ও আত্মিক প্রেরণা এ দু'টির ভারসাম্য বজায় রেখে মানবসমাজে সেবার আদান প্রদান ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থারই শিক্ষা। কিন্তু মানুষ যুগে যুগে আল্লাহর দেওয়া শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে এই ভারসাম্যকে নষ্ট কোরেছে। এবলিসের প্ররোচনায় সমাজের একটি শ্রেণী রাজশক্তি, ক্ষমতা, পেশীশক্তি, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক হোয়ে; দরিদ্র, কমজোর মানুষকে জোর কোরে বাধ্য কোরতে আরম্ভ কোরেছে তাদের সেবা করার জন্য। জোর কোরে কাজ করানোর প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হোল ঠিক তখনই ভারসাম্য হারিয়ে গেল, সেবক হোয়ে গেল দাস বা গোলাম, আর সেবা (Service) হোয়ে গেল দাসত্ব (Slavery)। মানুষের হৃদয় থেকে আল্লাহর উপস্থিতি চোলে গিয়ে তাদের মধ্যে যখন এবলিসের প্রভাব বেশী ক্রিয়াশীল হোল তখন তাদের মধ্যে এই ধারণা বাসা বাঁধলো যে, কিছু মানুষ তাদের দাস হিসেবে সেবা কোরতে বাধ্য। আর তারা ভোগ বিলাসে অলস জীবন যাপন শুরু কোরলো, আর এভাবেই সমাজে সৃষ্টি হোল দাস প্রথার। এই চরম ভারসাম্যহীনতা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে পৌছে গেল যে ঐ দাসদেরকে আর মানুষ বোলেই মনে করা হোত না। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন রকম মূল্যই ছিল না, তাদেরকে পণ্যের মত হাটে-বাজারে কেনা বেচা করা হোত, তাদেরকে দিয়ে কাজ আদায়ের জন্য নির্মমভাবে নির্যাতন করা হোত এমনকি তাদেরকে হত্যা করাও কোন অপরাধ হিসাবে পরিগণিত হোত না। ঐ নিষ্পেষিত মানুষগুলি যেন ঐ প্রভুরূপী মানুষদের শ্রম দিতে বাধ্য হয় সেজন্য তাদের জমিজমা, বিষয় সম্পত্তি সবকিছু কেড়ে নেওয়া হোত। ফলে নিরুপায় হোয়ে তারা বংশ পরম্পরায় প্রভুরূপী মানুষের শ্রমদাসত্ব স্বীকার কোরে নিত। আদম (আ:) থেকে শুরু কোরে শেষ নবী (দ:) পর্যন্ত আল্লাহ যুগে যুগে যে দীন পাঠিয়েছেন তার মূল রূপ চিরকালই ছিল অনন্য ভারসাম্যপূর্ণ। এই ভারসাম্য নষ্ট কোরে আত্মা হারিয়ে ফেলার কারণেই সমাজের যাবতীয় অন্যায় অশান্তির সূত্রপাত হোয়েছে। শুধু দাস প্রথাই নয়, ভারসাম্যহীনতা থেকেই সৃষ্টি হোয়েছে মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু, সবচেয়ে বড় ফেতনা দাজ্জালের।

আরবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এসলামের নবযুগ সূচনা:

প্রকৃতপক্ষে দাস হিসেবে মানুষ বেচা-কেনা মানবসমাজের একটি প্রাচীনতম ব্যবসা। আল্লাহর শেষ রসুল যখন আবির্ভূত হোলেন তখনও আরবের একটি বড় ব্যবসা ছিল দাস ব্যবসা। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে বন্দী কোরে, জাহাজ ভর্তি কোরে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদেরকে বিক্রি করা হোত। কেবল আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গই নয়, যুদ্ধবন্দীদেরকেও দাসদাসী হিসাবে বিক্রি কোরে দেওয়া হোত হরদম। যেহেতু বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য কাফেলাকে মক্কার উপর দিয়ে যেতে হতো তাই মক্কাও ছিল দাসব্যবসার একটি বড় কেন্দ্র। এই দাসদের দুঃখ দুর্দশা যে কি অবর্ণনীয় তা বর্ণনা কোরে হাজার হাজার বই লেখা হোয়েছে। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না, শুধু এটুকু বোললেই যথেষ্ট হবে, যে সমাজে সেবাকে দাসত্বে রূপান্তরিত হয় সেই সমাজ একটা জাহান্নাম, অপরদিকে যে সমাজে মানুষ পরস্পরকে ভালবেসে সেবা কোরে যায়, অন্যকে সাহায্য কোরে, দান কোরে, খাইয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করে সেটাই হোচ্ছে প্রকৃত এসলামের সমাজ। সুতরাং এসলামের সমাজব্যবস্থাই প্রকৃতপক্ষে সেবাভিত্তিক, আর বর্তমানে দাজ্জালের তৈরী সিস্টেমের মাধ্যমে জোর কোরে শ্রম আদায়ভিত্তিক অর্থাৎ দাসভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাই হচ্ছে প্রকৃত দাসভিত্তিক।

প্রমাণ: আল্লাহর রসুলের স্ত্রী আম্মাজান খাদিজা (রা:) খুব ধনাঢ্য ছিলেন। জাহেলি যুগে তিনি আরবের বাজার থেকে একটি দাস কিনেছিলেন, যার নাম ছিল যায়েদ ইবনে হারিসা। হুজুর পাক (সা:) এর সাথে বিয়ের পর তিনি যায়েদকে (রা:) স্বামীর সেবায় নিয়োগ কোরলেন। সঙ্গে সঙ্গে রসুলাল্লাহ (দ:) যায়েদকে আযাদ কোরে দিলেন। কিন্তু যায়েদ (রা:) রসুলাল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ কোরতে রাজি হোলেন না। মহানবী (দ:) তখনও নবী হন নি। যায়েদের (রা:) চাচা বাবারা তাকে খুঁজতে খুঁজতে মহানবীর (সা:) কাছে আসলেন। মোহাম্মদ (সা:) বোললেন, 'সে তো এখন মুক্ত, আপনারা তাকে নিয়ে যেতে পারেন।' কিন্তু যায়েদ (রা:) বোললেন উল্টো কথা। তিনি বাবা চাচা কে বোললেন, 'আপনারা ফিরে যান, আমি যাবো না। আমি তাঁর কাছেই থাকতে চাই।' সহজেই অনুমেয় যে যায়েদ (রা:) এর আচরণ কোন দাসের আচরণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি মহানবীর (দ:) আচরণে ও ব্যবহারে এতটাই মুগ্ধ ছিলেন যে, জীবনের শেষ দিন

পর্যন্ত মহানবীর (স:) ছায়ার মত অনুবর্তী ছিলেন।
আনাস (রা:) যখন বালক ছিলেন তখন তাঁর মা ছেলেকে এই বলে রসুলাল্লাহর (দ:) কাছে তুলে দিলেন যে, 'ইয়া রসুলাল্লাহ! ও আপনার কাছে থাকবে এবং আপনার সেবা কোরবে।' এমন কথা কি কেউ কোনদিন শুনেছে যে, একজন মা তার সন্তানকে এনে কারও দাসত্বে নিযুক্ত কোরেছে? ইতিহাস কখনো বলে না যে আনাস (রা:) রসুলাল্লাহর (দ:) দাস ছিলেন, বলা হয় খাদেম। খাদেম মানেই সেবক। আনাস (রা:) জীবনের একটা পর্যায়ে এসে ধনে, জনে, জ্ঞানে এতো সমৃদ্ধ হোলেন মানুষ দূর দূরান্ত থেকে তাঁর কাছ থেকে রসুলাল্লাহর (দ:) জীবন সম্পর্কে, এলসাম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ কোরতে আসতো। তিনি রসুলাল্লাহর (দ:) জুতাগুলো পর্যন্ত পরম শ্রদ্ধায় পরিষ্কার কোরে দিতেন যা ছিল প্রকৃত সেবা, দাসত্ব নয়। এরপর ওমর (রা:) এর উদাহরণ আছে যা অকল্পনীয়। মদীনা থেকে যেরুজালেম প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার পথ যার অধিকাংশই ছিল মরুভূমি। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় ওমরের (রা:) সঙ্গী ছিলেন একজন ব্যক্তি যাকে ইতিহাসে দাস বোলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এ কেমন দাস ছিলেন যাকে মনিব উটের পিঠে উঠিয়ে উটের রশি ধোরে উত্তপ্ত মরুর বালুকারাশির উপর দিয়ে পথ চলেন? আল্লাহর রসুল বোলেছিলেন, 'তোমাদের অধীনস্থরা তোমাদের ভাই'। এসলাম যে দাসকে ভাইয়ের মর্যাদা প্রদান কোরেছে তার উত্তম উদাহরণ হলো দ্বিতীয় খলিফার এই ইতিহাস। তাই দাস শব্দটি এসলামের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়। এসলামে কোন দাস দাসীর কোন ব্যবস্থা নাই। এসলামের আইন হোল, জোরপূর্বক কাউকে কোন কাজে বাধ্য করা যাবে না, বাধ্য কোরলে সে দণ্ডিত হবে। আল্লাহ হোচ্ছেন মালিকুল মুলক, রাজ্য-সাম্রাজ্যের মালিক, মালিকিন্নাস (মানুষের প্রভু), মা'বুদ (যার দাসত্ব কোরতে হয়), একমাত্র রাব্বুল আলামীন (সৃষ্টি জাহানের একচ্ছত্র প্রভু)। সুতরাং কোন মানুষ প্রকৃত অর্থে যেমনি কখনও কারও প্রভু বা মালিক (Master, Lord) হোতে পারে না, তেমনি কেউ কারও দাস বা গোলামও (Slave, Servant) হোতে পারে না। কেবল সেবক, অনুচর, সাহায্যকারী, কর্মচারী (Attendant, Helper, Employee) হোতে পারে। এবং সেই সেবক বা অনুচরদের সম্পর্কেই রসুলাল্লাহ বোলেছেন, 'তোমরা যা খাও তাদের কে তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরো তাদের কে তাই পরাবে, অসুস্থ হোলে তাদেরকে সেবা কোরবে।' হুজুরের এই কথাগুলি নিছক উপদেশ ছিল না, এগুলি ছিল উম্মাহর প্রতি তাঁর হুকুম অর্থাৎ দাসব্যবস্থা তো থাকবেই না বরং যারা স্বপ্রণোদিত হয়ে সেবা করার বা শ্রম দেওয়ার মানসে তাদের কাছে আসে তাদের সম্পর্কে পর্যন্তও এইসব হুকুম এবং সকল আসহাবগণ রসুলের এই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন কোরে গিয়েছেন। রসুলাল্লাহর শিক্ষাপ্রাপ্ত উম্মতে মোহাম্মদীর কেউ কোন সেবককে নির্যাতন করেছেন এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। একজন ব্যক্তির অধীনে একজন সেবক কাজ করবে কি করবে না, তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকতো। কোন সেবক তার মালিকের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে শাসকের কাছে নালিশ জানালে ন্যায়বিচার পেত। খলিফা ওমরের (রা:) একজন খ্রিস্টান সেবক ছিল যে বহু বছর খলিফার সঙ্গে ছিল কিন্তু এসলাম গ্রহণ করে নি। তাকে খলিফা নিজে বহুবার এসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু সে তার ধর্ম পরিবর্তন করে না। সুতরাং এসলামে সেবকদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও ছিল অবারিত।
অপরদিকে পৃথিবীতে যখনই বৈষয়িক উদ্দেশ্য ও মানবিকতার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তখনই মানুষ নিজেকে মালিক, প্রভু আর অধীনস্থদের দাস মনে কোরেছে। এগুলো একদিনে হয় নি, আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে অসম্ভব এক নির্যাতনের দিকে পৌঁছিয়েছে। যখন মানুষ ভেবেছে যে, আমি সকল জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে, বিধানের ঊর্ধ্বে, তখন সে চরম স্পর্ধায় নিজেই প্রভু হোয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই সে তার অধীনস্থদের গলায় শিকল লাগিয়ে, চামড়া পুড়িয়ে মার্কা দিয়ে, কথায় কথায় চাবুক পেটা করে, নাক কেঁটে, বস্ত্রহীন অবস্থায় দিনের পর দিন অনাহারে রেখে, পশুর খোয়াড়ে বাস কোরতে বাধ্য করেছে।

এসলাম দাস প্রথাকে বিলুপ্ত কোরেছে:

এসলামবিদ্বেষীরা এসলামের উপর যে অপবাদগুলি আরোপ কোরে থাকে তার মধ্যে একটি বড় অপবাদ হোচ্ছে, এসলামে নাকি দাসপ্রথাকে উৎসাহিত করা হোয়েছে, এখানে যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসরূপে এবং যুদ্ধবন্দিনীদের যৌনদাসীরূপে ব্যবহার করা যায়। এই ধারণাটি এত সর্বব্যাপী যে এসলামের আলেমরাও এই ধারণাকেই অনেকাংশে মেনে নিয়েছেন, তারা বিষয়টি অস্বীকার কোরতে পারেন না কারণ এসলাম-বিদ্বেষীরা পবিত্র কোর'আনের বেশ কিছু আয়াত তাদের বক্তব্যের পক্ষে উল্লেখ করেন এবং দেখিয়ে দেন যে, সত্যিই এসলামে দাসপ্রথা আছে এবং 'গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত দাসীদেরকে' উপপত্নীরূপে ব্যবহার করার অনুমতিও রোয়েছে। তাদের এইসব যুক্তির উপযুক্ত জবাব দিতে ব্যর্থ আলেমরা এসলামের অবমাননায় ক্ষুণ্ন হোয়ে দুর্বল কণ্ঠে বলার চেষ্টা করেন যে, হ্যাঁ, দাসপ্রথা আছে বটে, কিন্তু তাদেরকে যে অধিকার দেওয়া হোয়েছে সেগুলি আইয়ামে জাহেলিয়াতের চেয়ে অনেক বেশি। আসলে বিষয়টি তা নয়, প্রকৃত সত্য হোল, এসলামে জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থা বা দাস ব্যবস্থাই নেই। অধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গ এখানে আসেই না। অধিকার দেওয়ার কথা সেবকদের, দাসদের তো মুক্ত কোরেই দিতে বলা হোয়েছে। আমরা এই ভুল ধারণাটি ভেঙ্গে দিয়ে এ প্রসঙ্গে প্রকৃত এসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটি তুলে ধোরতে চাই। প্রচলিত কোর'আনে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহার কোরেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আরবি-বাংলা অভিধান মোতাবেক সেই পরিভাষাগুলির সঠিক অর্থগুলি এখানে দেয়া হোল।

(১) রাকাবাত: ক্রীতদাস, ঘাড়ে দড়ি বাঁধা (১০৪৭ পৃ: ১ম খণ্ড) সুতরাং সরল অর্থে রাকাবাত হোচ্ছে ক্রীতদাস যার কোন স্বাধীনতা থাকে না। তাকে জোরপূর্ব কাজে লাগানো হয়, বা এমন ব্যবস্থা কায়েম করা হয় যে, সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসত্বের শৃঙ্খল পরতে বাধ্য হয়।

(২) মালাকাত আয়মান: মালাকাত অর্থ: মানুষের ভিতরগত গুণ বা যোগ্যতা, প্রতিভা, আমি তার পূর্ণ মালিক (৮৪২ পৃ: ২য় খণ্ড), আর আয়মান অর্থ: ডানদিক, সৌভাগ্য, শক্তি, সামর্থ (১১০১ পৃ: ২য় খণ্ড)। সুতরাং মালাকাত আয়মান অর্থ যারা ন্যায়সঙ্গতভাবে, স্বেচ্ছায় স্বপ্রনোদিত হয়ে নিজেদের ভিতরকার গুণ, যোগ্যতা, প্রতিভা সবকিছু সহকারে সামর্থবানের অধীকারভুক্ত হয়। অনুবাদকরা কেউ কেউ একে অনুবাদ কোরেছেন, 'তোমাদের ডান হস্ত যাদেরকে অধিকার করিয়াছে'। এই অনুবাদ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না, স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকারের ধারণাটি এতে অনুপস্থিত থাকে।

(৩) 'আব্দ': দাস, ক্রীতদাস, গোলাম, উপাসক, সেবক, বান্দা, চাকর, দাসত্বে নিষ্ঠাবান দাস, যার পিতামাতাও দাস, বংশগত চাকর, নির্ভেজাল চাকর। এই শব্দটি আল্লাহ মানুষের ক্ষেত্রে বহুবার ব্যবহার কোরেছেন।

(৪) আমাতু: দাসী, বাঁদি, পরিচারিকা।

বিস্ময়কর বিষয় হোল, কোর'আনের অনুবাদকরা আল্লাহর ব্যবহৃত এই সবগুলি শব্দেরই প্রায় একই অনুবাদ কোরেছেন শুধুমাত্র 'দাস-দাসী'। এটা নিঃসন্দেহে ভুল অনুবাদ, কারণ সবগুলি শব্দের যদি একই অর্থ হোত, তাহোলে আল্লাহ নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার না কোরে একটি শব্দই ব্যবহার কোরতেন। এবার কোর'আনের এ সংক্রান্ত আয়াতগুলি লক্ষ্য কোরি:

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কৃত কোর'আনের অনুবাদ	শিক্ষা
১. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোন পূণ্য নাই; কিন্তু পূণ্য আছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, মালায়েকগণ, সমস্ত কেতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন কোরিলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান কোরিলে, সালাহ কায়েম কোরিলে ও যাকাত প্রদান কোরিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ কোরিলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ কোরিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মোত্তাকী (বাকারা- ১৭৭)।	এ আয়াতে শব্দ ব্যবহৃত হোয়েছে রাকাবাত। যখন দাস ক্রয় বিক্রয় প্রচলিত ছিল সেই যুগে দাসদের কিনে নিয়ে মুক্ত কোরে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে মো'মেনদের উৎসাহিত কোরছেন। আবু বকর (রাঃ) সহ আরও অনেক সাহাবী কাফেরদের কাছ থেকে দাসদের ক্রয় কোরে নিয়ে আযাদ কোরে দিয়েছেন, বেলাল (রাঃ) ছিলেন সেই মুক্তদাসদের অন্যতম যিনি ছিলেন রসুলাল্লাহর সার্বক্ষণিক সহচর এবং যাকে রসুলাল্লাহ মোয়াজ্জেন হিসাবে সম্মানিত কোরেছিলেন। কাজেই যেখানে দাসদের মুক্ত কোরে দেওয়াকে পুণ্যের কাজ বলা হয়, সেই দাসদেরকে আবার মো'মেনদের অধীনস্থ কোরে রাখার কথা আল্লাহ বোলতে পারেন না।
২. মোশরেক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ কোরিও না। মোশরেক নারী তোমাদিগকে মুগ্ধ কোরিলেও, নিশ্চয়ই মো'মেন কৃতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মোশরেক পুরুষের সহিত তোমরা বিবাহ দিও না, মোশরেক পুরুষ তোমাদিগকে মুগ্ধ কোরিলেও, মো'মেন কৃতদাস তাহা অপেক্ষা উত্তম (বাকারা- ২২১)।	এ আয়াতে আল্লাহ 'আমাতু মো'মেনাতুন', 'আবদে মো'মেন' শব্দ দু'টি ব্যবহার কোরেছেন যার অর্থ মো'মেন কৃতদাসী এবং মো'মেন কৃতদাস। অনেকে তখনও রসুলাল্লাহর প্রতি ঈমান এনে মো'মেন মো'মেনা হোয়েছিলেন কিন্তু কাফেরদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হন নি। এই সব বন্দীদের সম্মান ও মর্যাদা মোশরেকদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। এমন কি মো'মেনদের সমাজেও যারা পরিচারক-পরিচারিকা বা সেবকের কাজ কোরে থাকে মোশরেক বিয়ে করা থেকে তাদেরকে বিয়ে করা উত্তম। উপরন্তু, এ আয়াতে আল্লাহ উক্ত পরিচারিকাদেরকে বিয়ে কোরে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ কোরেছেন, উপপত্নি হিসাবে গ্রহণ কোরতে বলেন নি।
৩. তোমরা আল্লাহর এবাদত কোরিবে ও কোন কিছুকে তাঁহার শরিক কোরিবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট-প্রতিবেশী, দূর-প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কোরিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে (নিসা- ৩৬)।	আল্লাহ এক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহার কোরেছেন মালাকাত আয়মান যার অর্থ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মন প্রাণ মো'মেনের সেবায় সমর্পিত কোরেছেন। এই ব্যক্তি আর ক্রীতদাস কি এক অর্থ হোতে পারে? মালাকাত আয়মান তার এই সেবাকর্মে নিয়োজিত থাকা বা না থাকার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন।
৪. যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যেহার (নিজের স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা) করে এবং পরে উহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ কোরিবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত কোরিতে হইবে, ইহা দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার খবর রাখেন (মুজাদালা- ৩)। [আরও দেখুন সুরা বালাদ- ১৩, ১৪, সুরা নেসা- ৯২, সুরা মায়েদা- ৮৯]	শব্দ ব্যবহৃত হোয়েছে রাকাবাত। নিজের স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা একটি গর্হিত কাজ। এই কাজের জন্য আল্লাহ কাফফারা ঠিক কোরলেন একজন রাকাবাত বা ক্রীতদাস মুক্ত করা। পাপ স্খলনের জন্য প্রায়শ্চিত্যরূপে যে কাজটি করার নির্দেশ আল্লাহ দিচ্ছেন সেই কাজ নিঃসন্দেহে একটি পুণ্যের কাজ। অনেক সাহাবীরই জাহেলি যুগের কেনা ক্রীতদাস ছিল। আল্লাহর অভিপ্রায় হোচ্ছে পৃথিবীর সকল মানুষ হবে পরম স্বাধীন, তাই তিনি দাসমুক্তির জন্য মো'মেনদেরকে উৎসাহিত কোরলেন এবং মুক্তির বিভিন্ন পথ দিলেন, তার মধ্যে কাফফারা একটি। মো'মেন হত্যা করার জন্যও, বৃথা শপথের জন্য দাসমুক্ত (রাকাবাত) করার বিধান আল্লাহ দিয়েছেন।
৫. আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হোইয়াছে তাহারা তাহাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদিগকে নিজেদের জীবনোপকরণ হোইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদের সমান হইয়া যায়। তবে কি উহারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে? (নাহল- ৭১)	আয়াতে ব্যবহৃত "মালাকাত আয়মান" শব্দটির প্রকৃত অর্থ দাস-দাসী নয়, এর অর্থ স্বেচ্ছা-সমর্পিত সেবক। এই সেবকদেরকে দান করার ব্যাপারে কোনরূপ কার্পণ্য যেন না করা হয় সে বিষয়ে আল্লাহ মো'মেনদেরকে এ আয়াতে সাবধান কোরেছেন। এমনভাবে তাদেরকে জীবনোপকরণ থেকে দান কোরেতে বোলেছেন যেন তারাও পার্থিব সম্পদে তার মনিবের সমকক্ষ হোয়ে গেলেও কার্পণ্য না করা হয়।
৬. হে মো'মেনগণ! তোমাদিগের মালিকানাধীন দাস-দাসীগণ এবং তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদিগের কক্ষে প্রবেশ কোরিতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদিগের পোশাক খুলিয়া রাখ তখন এবং এশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদিগের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ব্যতিত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ কোরিলে তোমাদিগের জন্য ও তাহাদের জন্য কোন দোষ নাই। তোমাদিগের এককে অপরের নিকট তো যাতায়াত কোরিতেই হয়। এমনি কোরিয়া আল্লাহ তোমাদিগের নিকট তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (নূর- ৫৮)।	মালাকাত আয়মানরাও মো'মেনদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ঐ তিন একান্ত গোপনীয়তার (Privacy) সময় ছাড়া সব সময় গৃহের সর্বত্র যাতায়াতের জন্য অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন। এই অধিকার ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন কৃত কোর'আনের অনুবাদ	শিক্ষা
আল্লাহ্ উপমা দিতেছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোনকিছুর উপর শক্তি রাখে না এবং এমন এক ব্যক্তির যাহাকে তিনি নিজ হইতে উত্তম রিযিক দান করিয়াছেন এবং সে উহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; উহারা কি একে অপরের সমান? সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লারই প্রাপ্য; অথচ উহাদের অধিকাংশই ইহা জানে না। সুরা নাহল-৭৫।	একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় হোচ্ছে, কোর'আনের সর্বত্র মানুষকে আল্লাহর আবদ বা দাস বলা হোয়েছে, কেবলমাত্র এই আয়াতে মানুষকে মানুষের 'আব্‌দ' হিসাবে উপমা দেওয়া হোয়েছে। এই দাসত্বকে বিশেষায়িত কোরতে আল্লাহ আরও একটি শব্দ সাথে যোগ কোরেছেন 'মামলুকান'। আরবী বাংলা অভিধানে 'মামলুক' শব্দের অর্থ লেখা হোয়েছে ক্রীতদাস, গোলাম, দাসবংশ, রাজবংশ (২য় খণ্ড ৮৫১ পৃ)। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ 'আবদান মামলুকান' বোলে এমন এক ক্রীতদাসের উপমা দিয়েছেন যার কোন কিছুর উপর অধিকার নেই, কোন ইচ্ছাশক্তি নেই অর্থাৎ দাসানুদাস, বংশগত দাস। প্রকৃত এসলাম হারিয়ে যাওয়ার পরে যখন রাজতন্ত্র চোলছিল, তখন ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ইরান, মিশর, দিল্লি ও ইরাকে দাস সৈন্যরা শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হোয়েছিলেন, তাদের রাজত্বকে ইতিহাসে মামলুক রাজবংশ *(Mamluk sultanate)* বলা হোয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ মানুষের দাস হোতে পারে না, সে একমাত্র আল্লাহর দাস। সে আল্লাহর এমন দাস যাকে আল্লাহ কারও কাছ থেকে কিনে আনেন নি, বরং নিজেই তাকে সৃষ্টি কোরে জীবন দান কোরেছেন, তারপর প্রতি মুহূর্তে জীবনোপকরণ, আলো-বাতাস-পানি সরবরাহ কোরে বাঁচিয়ে রাখছেন। তাই মানুষের নির্বাক আনুগত্য ও দাসত্বের ন্যায্য হকদার মহান আল্লাহ্। তবুও আল্লাহ কোথাও মানুষকে তাঁর দাসত্বে বাধ্য করেন নি। তিনি মানুষের মধ্যে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন (সুরা হেজর ২৯), ফলে তার ভেতরে বিকশিত হোয়েছে আল্লাহর বৈশিষ্ট্য কাদেরিয়াত বা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি- যা ব্যবহার কোরে সে চাইলে আল্লাহর দাসত্ব কোরতে পারে, না চাইলে নাও কোরতে পারে। সে স্বেচ্ছায় আল্লাহর দাসত্ব কোরলে পৃথিবীতে শান্তিতে থাকবে, পরকালে পুরস্কার লাভ কোরবে, আর দাসত্ব না কোরলে দুনিয়াতে অশান্তি ভোগ কোরবে আর পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ কোরবে। এই আয়াতের মাধ্যমে মানুষের জোরপূর্বক দাসত্বকে লুপ্ত কোরে এমন একটি সমাজের চিত্র অঙ্কন কোরেছেন যেখানে প্রতিটি মানুষ এমন হবে যাকে **আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে চমৎকার জীবনোপকরণ কোরবেন এবং সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় কোরতে পারবে**। অর্থাৎ মানুষ হবে চিন্তা, চেতনায় ও কর্মে সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সুতরাং এটা প্রমাণিত যে, এসলামে ক্রীতদাস প্রথা নেই, যেটা আছে সেটা সম্মতিপূর্বক সেবাদান। ক্রীতদাস আর মালাকাত আয়মানের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। একটি গলায় দড়ি পরিয়ে বাধ্য কোরে কাজ করানো, আরেকটি মনপ্রাণ, আত্মা সমস্তকিছু সমর্পণ কোরে সেবা করা। এই দু'টি শব্দের কি একই অর্থ হোতে পারে? সুতরাং যারা কোর'আন অনুবাদ কোরেছেন তাদের অবশ্যই উচিৎ ছিল আল্লাহর ব্যবহৃত শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ দিয়ে অনুবাদ করা। তা না কোরে তারা উভয়টিই দাস হিসাবে অনুবাদ কোরেছেন। অবশ্য এর পেছনেও একটি সুগভীর কারণ রয়েছে।

যখন আসহাবরা দুনিয়া থেকে চোলে গেছেন, প্রকৃত মো'মেনরা চোলে গেছেন তখন সেই আরবদের অনেকের মধ্যেই প্রাচীন জাহেলিয়াত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে তাদের হাতে অর্ধ-দুনিয়া, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের আনুগত্য কোরছে। তারা আবার নিজেদেরকে ধারণা কোরতে শুরু কোরেছিল মানুষের মালিক, প্রভু বোলে । রসুলাল্লাহ যে জাহেলিয়াতের কবর দিয়েছিলেন, তারা সুযোগ পেয়েই আবার সেই জাহেলিয়াত অর্থাৎ দাসত্ব, জোর কোরে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে দিয়ে কাজ করানোর প্রবণতা ইত্যাদি ফিরিয়ে আনল। তথাকথিত খেলাফতের সময় তাগুত রাজা-বাদশাহদের মত ভোগবিলাসে মত্ত শাসকেরা যে জাহেলি ব্যবস্থাকে কবর থেকে তুলে এনেছিল, আজও তাদের উত্তরসুরী অহঙ্কারী আরব শেখরা সমগ্র দুনিয়া থেকে শ্রমিক আমদানী কোরে জোর কোরে শ্রম আদায় কোরে সে ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছে। তাদের এই শ্রমদাস সরবরাহ করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিতে ম্যানপাওয়ার ব্যবসা জমজমাট। উপরন্তু কোন অপরাধ কোরলে এই শ্রমিকদেরকে পূর্ণ শাস্তি ভোগ কোরতে হয়, কিন্তু তাদের দেশের প্রভাবশালী, অর্থশালীরা একই অপরাধ কোরে লঘুদণ্ডে মুক্তি পেয়ে যায়। যখন কোর'আনের অনুবাদ করা শুরু হয় তখন সেই অনুবাদকদের সামনে আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলামটি নেই, আছে আরব শেখদের বিকৃত করা শিয়া, সুন্নী, পীর ফকিরদের এসলাম। সেই বিকৃত এসলামগুলিই ছিল অনুবাদক-আলেম, মোফাসসেরদের জ্ঞানের পরিসীমা। ফলে তারা যুদ্ধবন্দী, গনিমত, রাকাবাত, মালাকাত আয়মান সব কিছুর একটি অর্থই জানেন, আর সেটা হোচ্ছে 'দাস-দাসী'। অবশ্য উমাইয়া, আব্বাসীয় রাজা বাদশাহরা তাদের অধীনস্থদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ-রসুলের বেঁধে দেওয়া সীমানা মেনে চলেন নি। তারা রসুলের জীবনাদর্শ ভুলে যান। সেই অনুবাদকেরা দয়া কোরে যদি একবার রসুলাল্লাহর জীবনের দিকে তাকান তবে দেখতে পাবেন, আল্লাহর রসুল এই দাসত্ব প্রথাকে নির্মূল করার জন্য আজীবন কী সংগ্রামটাই না কোরে গেছেন। এই সংগ্রাম কেবল যে কাফেরদের বিরুদ্ধে তা নয়, এটা ছিল বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত একটি সিস্টেমের বিরুদ্ধে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধোরে মানুষের মন মগজে শেকর গেঁড়ে বোসে ছিল। তিনি ক্রীতদাস যায়েদকে (রাঃ) মুক্ত কোরলেন। যায়েদ মুক্তি পেয়েও তাঁর সাথেই রোইলেন। এরপর রসুল যায়েদকে নিজের ছেলে বোলে ঘোষণা দিলেন, বোললেন যায়েদ (রাঃ) তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকার। এটা ছিল

কোরায়েশদের মিথ্যা আভিজাত্যের দেয়ালে এক প্রচণ্ড আঘাত। চারিদিকে ছি ছি পড়ে গেল, কী! গোলামকে ছেলে বোলে ঘোষণা দিল মোহাম্মদ! রসুল বিচলিত হোলেন না, নিজ সিদ্ধান্তে অটল রোইলেন। এ হোল নবী হওয়ার আগের কথা। নবী হওয়ার পরে তিনি নিজ ফুফাতো বোন জয়নাবের (রাঃ) সঙ্গে যায়েদকে (রাঃ) বিয়ে দিলেন। তাদের বিয়ে টিকলো না, যার অন্যতম কারণ জয়নাব (রাঃ) রসুলাল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে যায়েদকে (রাঃ) স্বামী হিসাবে গ্রহণ কোরলেও তিনি যায়েদের পূর্ব পরিচয় ভুলতে পারেন নি। রসুলাল্লাহ খেয়াল কোরেছেন যে, তাঁর উম্মাহর মধ্যে অনেকেই যায়েদকে (রাঃ) তখনও ভিন্নভাবেই দেখে। এরপর রসুল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যায়েদকে (রাঃ) মু'তার যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ দিলেন। তাঁর অধীনে যুদ্ধে প্রেরণ কোরলেন পুরো জাতিকে যার মধ্যে কোরায়েশসহ বড় বড় সম্ভ্রান্ত বংশীয় অনেক সাহাবীই ছিলেন। যায়েদকে (রাঃ) সেনাপতি নিয়োগ দেওয়ার পর অনেকেই সন্তুষ্টচিত্তে বিষয়টি মেনে নিতে পারলো না, বিশেষ কোরে মোনাফেকরা জাতির ভিতরে জোর তৎপরতা চালালো যে, একজন দাসকে সকলের আমীর করা হোল? এটা কেমন কথা? এসব কথা শুনে রসুলাল্লাহ প্রচণ্ড রাগ কোরলেন এবং সবাইকে মসজিদে নববীতে ডেকে সাবধান কোরে দিলেন।

মু'তা যুদ্ধে যায়েদ (রাঃ) শহীদ হন। রসুলাল্লাহ তাঁর এন্তেকালের স্বল্পকাল আগে সেই যায়েদ (রাঃ) এর পুত্র ওসামা এবনে যায়দ এবনে হারিসাকে (রাঃ) সিরিয়া-ফিলিস্তীনের দারুস ও জর্দানের অন্তর্গত বালকা' সীমান্ত অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। এটা ছিল রসুলাল্লাহর জীবদ্দশায় সর্বশেষ অভিযান। প্রবীণ মোহাজেরগণের প্রায় সকলেই ওসামা (রাঃ) এর বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হন। কতিপয় লোক তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেন। তাদের মন্তব্য ছিল, প্রবীণ আনসার ও মোহাজেরদের উপর এত তরুণ একজনকে অধিনায়ক করা হোয়েছে। তাদের মূল আপত্তি ছিল, ওসামা একজন ক্রীতদাসের পুত্র। এসব আলোচনা শুনে রসুল মাথায় পট্টি বাঁধা অবস্থায় দু'জনের কাঁধে ভর করে মসজিদে যান এবং সকলকে ডেকে আবারও বলেন, 'হে সমবেত লোকেরা! তোমরা ওসামার যুদ্ধাভিযান কার্যকর কর। আমার জীবনের শপথ! তোমরা যদি তার নেতৃত্ব নিয়ে কথা বোলে থাক, তবে এর আগে তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারে তো কথা তুলেছিলে। অথচ সে নেতৃত্বের যোগ্যই বটে, যেমন তার পিতাও এর যোগ্য ছিল। সে আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়; আর তার পরে এই ওসামাও আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।' রসুলের এই কথার পর সব গুঞ্জন থেমে যায়।

এভাবে আল্লাহর রসুল একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে উপর্যুপুরি আঘাতে চুরমার কোরে দিয়ে গেছেন। বর্তমান পৃথিবী দাজ্জালের অধীন, পশ্চিমারা এখন বিজয়ী জাতি। যেহেতু বিজয়ীরাই ইতিহাস লেখে তাই সেই ইতিহাস সব সময় সত্য বলে না। এ কারণেই পাশ্চাত্য দাজ্জালি সভ্যতার অনুসারীরা আমাদেরকে শেখায় যে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাস প্রথার অবসান ঘটান এবং মুক্তি ঘোষণার (Emancipation Proclamation) মাধ্যমে দাসদের মুক্ত করে দেন। সেই আব্রাহাম লিঙ্কনের স্বপ্নের গণতন্ত্রই আজ পুঁজিবাদী রূপ নিয়েছে। মানবজাতির মধ্যে সৃষ্টি কোরেছে বিরাট ভারসাম্যহীনতা। গুটিকয়েক লোক অকল্পনীয় অর্থের মালিক হোয়ে জঘন্য ভোগবিলাসে লিপ্ত, অর্থ খরচ করার পথ পাচ্ছে না। অপরদিকে বিরাট জনগোষ্ঠী বাধ্য হোয়ে জীবন রক্ষার জন্য দাসত্বের অদৃশ্য শৃঙ্খল গলায় পরে আছে। এই দাসত্বে প্রধান একটি রূপ কর্পোরেট দাসত্ব। নিয়োগকর্তা মালিকপক্ষের অন্যায়, জুলুম, বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির ক্ষোভ, অসন্তোষ চূড়ান্ত রূপ ধারণ কোরেছে। সুযোগ পেলেই সহিংসতা ও বিক্ষোভের আকারে প্রকাশ ঘটে সেই সঞ্চিত ক্ষোভের। শ্রমিকদের এই বিক্ষোভগুলিকে জোর কোরে দাবিয়ে রাখা হয়, পেটানো হয়, মেরে ফেলা হয়।

কিন্তু এসলাম এর ঠিক বিপরীত। স্বেচ্ছায়, উভয়পক্ষের সম্মতিতে, সেবা প্রদানের মানসে শ্রম প্রদানই হোচ্ছে এসলামের নীতি। মানবজাতির রহমতস্বরূপ আবির্ভূত মহানবী নিজের জীবনে বাস্তবে প্রয়োগ কোরে এবং তাঁর অনুসারীরাও তা বাস্তবায়ন কোরে কিভাবে দাসপ্রথা (জোরপূর্বক শ্রম আদায়) ব্যবস্থা চিরতরে নির্মূল কোরলেন তা আর এই জাতিকে জানতে দেওয়া হোল না। মক্কা বিজয়ের পর ক্বাবা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি সংক্ষেপে আগামী পর্বে তুলে ধোরব এনশা'ল্লাহ।

মক্কা বিজয়ের পর কা'বা প্রাঙ্গনে দ্বিতীয় ভাষণ:

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে হেদায়াত (পথ নির্দেশ) কোরছি যে, সেবকদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। তাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমরা কি অবগত নও যে, তাদের কাছেও এমন এক হৃদয় রোয়েছে যা কষ্ট পেলে ব্যথিত হয় এবং আরামে খুশী হয়? তোমাদের কি হোল যে, তোমরা তাদের হৃদয়ের সন্তুষ্টি বিধান করো না? আমি লক্ষ্য কোরছি, তোমরা তাদেরকে হীন মনে করো এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো না। এটা কি? এটা কি জাহেলিয়াতের অহঙ্কার নয়? নিঃসন্দেহে এটা যুলুম ও বে-ইনসাফী।

আমি জানি, জাহেলিয়াতের যুগে তাদের কোন মর্যাদা ছিল না। পশুর চেয়েও তাদেরকে অধম মনে করা হোত। সর্বত্র আমীর ও গোত্র-সর্দাররা সম্মান ও কর্তৃত্বের মালিক সেজে বোসেছিল। আল্লাহর বান্দারা এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে, মানুষ হিসাবে সবাই সমান এবং তোমাদের খেদমত-কারীরাও ইনসাফের অধিকারী। সেটা ছিল এমন এক যুগ, যখন আমীর ওমরাহ এবং শাসকবর্গ তাদেরকে মানবীয় স্তরের উর্দ্ধে মনে কোরত। নিজেদেরকে নিষ্পাপ ঘোষণা কোরত। তাদের দৃষ্টিতে খাদেমদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মনিবদের খেদমত করা এবং তাদের যুলুম সহ্য করা। মনিবদের সাথে কাজের লোকদের বসা নিষিদ্ধ ছিল। তাদের সামনে খাদেমদের কথা বলা পাপ ছিল। মনিবদের কোন কাজের সামান্যতম বিরুদ্ধাচারণ হত্যাযোগ্য অপরাধ ছিল। এসলাম এ ধরণের রসম-রেওয়াজের অবসান ঘোটিয়েছে এবং জাহেলী অহঙ্কারকে ধূলিস্মাৎ কোরে দিয়েছে।

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে অবহিত কোরছি যে, তোমাদের রবের ফরমান হোচ্ছে:

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি কোরেছি এক পুরুষ ও এক নারী হোতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত কোরেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হোতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।' (হুজরাত ১৩)

তোমরা জানো যে, সকল মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরি। তাহোলে অহঙ্কারের হেতু কি? মনে রাখবে, এসলামের দৃষ্টিতে মানবতার উর্দ্ধে কোন মর্যাদা নেই এবং মনিব-কাজের লোক, উচ্চ-নীচু, ধনী-গরীব সবাই সমান। এসলামের দৃষ্টিতে যে জিনিস বৈশিষ্ট্যের দাবি কোরতে পারে তা হোচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সতর্কতা)

ও আমলে সালেহ (দীন প্রতিষ্ঠার কাজ)। এটাই যখন বাস্তব তখন কেন তোমরা তোমাদের কাজের লোকদেরকে নীচ মনে করো? আমি লক্ষ্য কোরেছি যে, মনিবের সাথে কোন গোলাম কথা বোলতে চাইলে রাগে মনিবের চেহারা হিংস্র প্রাণীর মতো রক্তলোলুপ হোয়ে যায় এবং সে কোনভাবেই তার ক্রোধ দমন কোরতে পারে না। এটা জাহেলিয়াত ছাড়া আর কি হোতে পারে? এমন হোতে পারে, কাজের লোক তার মনিবের চেয়ে উত্তম এবং তার আমলও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।

হে মানুষ! যখন হুকুমত ছিল জাহেলিয়াতের এবং নফসের পূজা তার চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার কোরেছিল মানুষের উপর, তখন যে কি মর্মান্তিক দৃশ্যের সৃষ্টি হোয়েছিল তা মানবতার দৃষ্টি কখনও ভুলতে পারে না। আমি সে যুগও দেখেছি, যখন দাসদের সাথে বর্বর আচরণ ও যুলুম করা হোত। মহাপবিত্র আল্লাহ তাদের উপর রহম কোরেছেন, তাদের অধিকার প্রকাশ কোরে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার হেদায়াত কোরেছেন। আমি আমার রবের ফরমান মোতাবেক বোলছি যে, তোমরা তাদেরকে নিজেদের ভাই মনে করো। তাদের কাছ থেকে এতটুকু কাজ আদায় করো যতটুকু তারা সহজে কোরতে পারে। তোমরা যা খাও তাদেরকে তা খেতে দাও। তোমরা যা পরো তাই তাদেরকে পোরতে দাও। তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করো যেরূপ তোমরা আপনজনের সাথে কোরে থাকো, তাদের জন্য তা পছন্দ করো যা তোমরা নিজেদের জন্য করো। তাদেরকে নীচ ও তুচ্ছ মনে কোর না। তোমরা যখন সফরে যাও আর তারাও তোমাদের সঙ্গে থাকে, তখন তাদের আরামের প্রতিও খেয়াল রেখো। তোমাদের সাথে সওয়ারী থাকলে কিছুক্ষণ তোমরা আরোহণ করো এবং কিছুক্ষণ তাদেরকেও আরোহণের অনুমতি দিও। মানুষ হিসেবে তারা কোন অংশেই তোমাদের চেয়ে ছোট নয়। যেরূপ হৃদয় তোমাদের রোয়েছে; সেরূপ তাদেরও রোয়েছে। তোমরা কি লক্ষ্য করো নি যে, আমি যায়েদকে আযাদ কোরে আমার ফুফাতো বোনের সাথে তার বিয়ে দিয়েছি এবং বেলালকে মু'আযযেন নিযুক্ত কোরেছি এজন্য যে তারা আমার ভাই। তোমরা দেখেছো যে আনাস আমার কাছে থাকে, তাকে আমি ছোট মনে কোরি না। কোন কাজ না কোরলেও আমি তাকে বোলি না যে কেন তুমি তা করো নি। ঘটনাক্রমে তার দ্বারা কোন ক্ষতি হোয়ে গেলেও আমি তাকে কোন ভর্ৎসনা কোরি না। আমি তোমাদেরকে নসিহত কোরছি যে, তোমাদের কোন খাদেম যখন খাবার নিয়ে আসে তখন তাকেও তোমাদের সাথে বসানো উচিৎ। তারা যদি একসঙ্গে বোসতে পছন্দ না করে, তাহোলে তাদেরকে কিছু খাবার দিয়ে দেয়া উচিৎ। তোমাদের কোন সেবক অপরাধ কোরে থাকলে সত্তরবার তাকে মাফ কোরবে–এ জন্য যে, তুমি যাঁর গোলাম, তিনি তোমার অপরাধ হাজার বার মাফ কোরে দেন। মনে রেখো, কোন লোক তার গোলামের প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ কোরলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। আমি পুনরায় তোমাদেরকে বোলছি, তোমাদের সেবক তোমাদের ভাই। তারা বাধ্য হোয়ে তোমাদের অধীন হোয়েছে। তাই যার ভাই তার নিজের অধীন তার উচিৎ, সে নিজে যা খায় তা-ই তাকে খেতে দেয়, নিজে যা পরে তা-ই তাকে পোরতে দেয় এবং সাধ্যের বাইরে তার কাছ থেকে কোন কাজ আদায় না করে। সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতাল্লাহ।

আধুনিক দাসপ্রথার ভয়ঙ্কর রূপঃ

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'ওয়ার্ক ফ্রী ফাউন্ডেশন' এর পক্ষ থেকে 'দ্যা গ্লোবাল স্লেভারী ইনডেক্স ২০১৩' নামে একটি সূচক প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে এই সভ্যযুগেও তিন কোটি মানুষ শ্রমদাসত্বের শিকার। অন্যদিকে উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে 'অ্যান্টি-স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি শ্রমদাস বিরোধী সংগঠন দাবি করেছেযে বর্তমানের এই শ্রমদাস সংখ্যা, প্রায় ৪০০ বছরের ইতিহাসে আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় আনা আফ্রিকান দাসের মোট সংখ্যাও এর প্রায় অর্ধেক। জরিপে দেখা যায়, দাসত্ব অবস্থায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক (১ কোটি ৪০ লাখ) লোক বাস করে ভারতে। কিন্তু দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (প্রায় ৪ ভাগ) মানুষ দাসত্ব পরিবেশে বাস করে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মৌরিতানিয়ায়। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীন (২৯ লাখ ৪৯ হাজার ২৪৩), তৃতীয় অবস্থানে পাকিস্তান (২১ লাখ ২৭ হাজার ১৩২), মৌরিতানিয়ায় এ সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪ ভাগ। আর বাংলাদেশের অবস্থান দশম। দাসত্বের শিকার হওয়া এসব মানুষকে জোর করে শ্রমদানে বাধ্য করা হয়, ঠিক যেমনটি করা হত প্রাচীন দাসযুগে। নতুন এই দাসদের দিয়ে বলপ্রয়োগ করে বিনা পারিশ্রমিকে খাটানো হয়। এটা হোচ্ছে আধুনিক দাসপ্রথার একটি খণ্ডচিত্র। পুরো চিত্র আরও ভয়ঙ্কর। পুরো পৃথিবীকে তিনটি ভাগে ভাগ কোরেছে দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান 'সভ্যতা'। তারা ঔপনিবেশিক যুগে বিশ্বের সমৃদ্ধ ও খনিজসম্পদে পূর্ণ দেশগুলিকে সামরিক শক্তিবলে, ছলে-বলে-কৌশলে পদানত কোরে ভাইপারের মত শোষণ কোরে বর্তমানে সম্পদের পাহাড়ের উপরে বোসে আছে। তারা যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি দুনিয়াময় চালু কোরেছে সেই সিস্টেমে আজও সারা দুনিয়ার সম্পদ হাতড়ে নিজেদের কোষাগারে জড়ো কোরছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপরে বাধ্যতামূলক দারিদ্র্য চাপিয়ে দিয়েছে, ফলে সে দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষকে দারিদ্রসীমার নিচে বাস কোরতে হোচ্ছে । তারা বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্ত পূরণের জন্য বাধ্য হোচ্ছে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম দিতে । আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে চিন্তা কোরলে উদাহরণ হিসাবে আমরা পোশাকশিল্প খাতকে নিতে পারি। অতি অল্প বেতনে এখানে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। কাগজে কলমে ৮ ঘণ্টা সর্বোচ্চ কর্মঘণ্টা হোলেও কেউ যদি ওভারটাইম না করে চাকরি থাকে না। অমানবিক বেতনে মানবেতর পরিবেশে বাস কোরতে তারা বাধ্য হয়। তার উপর কয়েকমাসের বেতন বকেয়া রাখা হয় যেন কেউ চাকরি ছাড়তে না পারে। এভাবে সিস্টেমের অদৃশ্য দড়ি দিয়ে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হোয়েছে বস্ত্রশিল্প খাতের লাখ লাখ মানুষকে। এ করুণ অবস্থার কারণ নিয়ম, নীতি, পদ্ধতির ভারসাম্যহীনতা। আজ আবার দাজ্জালের আত্মাহীন জীবনব্যবস্থায় সকল সেবাই টাকা দিয়ে কিনতে হয়। পারিবারিক পরিবেশে স্বজনদের আন্তরিক সেবা একজন অসুস্থ মানুষকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুস্থতায় ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। সেখানে টাকার বিনিময়ে হাসপাতালে গিয়ে চড়ামূল্যে যে সেবা কিনতে হচ্ছে তার মধ্যে আর যাই থাক আন্তরিকতা থাকতে পারে না। ফলে হাসপাতালে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যায়। এমনই অবস্থা সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের। এছাড়াও আধুনিক শ্রমদাসদের ব্যাপারে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকগণ ক্ষেত্র বিশেষে নামমাত্র কিংবা বিনা পারিশ্রমিক দিয়ে যেভাবে শ্রম আদায় করছে তাতে অধিকাংশ আধুনিক শ্রমজীবীরাই কার্যত দাস পদবাচ্য হয়ে পড়েছে। ক্রীতদাস প্রথার আধুনিক নাম দাঁড়িয়েছে আদম ব্যবসা বা ম্যানপাওয়ার বিজনেস। প্রাক-এসলামী যুগের আরবরা আফ্রিকানদেরকে দাস হিসাবে কিনে আনতো, এখন কিনে নেয় আমাদের মত স্বল্পমূল্যে আত্মবিক্রয়ে সন্তুষ্ট তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে যেটা এই নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ কোরেছিলাম। এসলামে একজন মালিককে তার অধীনস্থ সেবককে ঠিক সেই পরিমাণে খাবার দিতে হয় যা সে নিজে ভোগ করে, সেই পরিমাণে পোশাক দিতে হয় যা যা সে নিজে পরিধান করে, অসুস্থ হলে সেই পরিমাণ চিকিৎসা দিতে হয় যা

সে নিজে গ্রহণ করে। কিন্তু আধুনিক দাসদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই সামান্য বেতন দিয়েই মালিক তার দায়-দায়িত্ব শেষ করে। তাই বলা যায় আধুনিক দাসত্ব ক্রীতদাস প্রথার চাইতেও করুণ, নৃশংস এবং অমানবিক।

মুক্তির পথঃ

অতীতে যখনই এই ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে, তখনই সেবক দাসে পরিণত হয়েছে। মালিকও হোয়ে গেছে চরম অহঙ্কারী। তার দৃষ্টিতে শ্রমিকরা নিচু শ্রেণির মানুষ। অপরদিকে বছরের পর বছর এমন কি প্রজন্মের পর প্রজন্ম দাসত্বের কারণে দাসদের মন মানসিকতায় জন্ম নিয়েছে নিদারুণ হীনম্মন্যতা ও দাস মনোবৃত্তি। শত শত বছরের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, গোলামির ঘানি টেনে টেনে নিজেরাও হোয়ে গেছে শিষ্ঠাচার বর্জিত, স্বাধীন চিন্তায় অক্ষম, উদ্ভাবনী শক্তিহীন সর্বোপরি নৈতিক চরিত্রহীন। বর্তমানে মানবজাতি দু'টি ভাগে বিভক্ত। প্রভু ও গোলাম। প্রভুর সাধ্য নেই দাসের কষ্ট বোঝার, দাসের সাধ্য নেই প্রভুর মন বোঝার। এবলিসের প্ররোচনায় তারা উভয়েই তাদের প্রকৃত অবস্থান থেকে সোরে গেছে। এখন যদি কেউ চিন্তা করে মালিক আর শ্রমিককে এক পংক্তিতে বসাবে সেটা হবে অপ্রাকৃতিক, আরোপিত ও লোক দেখানো, সেটা স্বতঃস্ফূর্ত হবে না। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ চেয়েছিল শ্রেণি বৈষম্য মিটিয়ে মালিক আর শ্রমিককে এক কাতারে সামিল কোরবে যা নিদারুণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোয়েছে। অতীতে দাসত্বের নিগড় থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মানুষ যেভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়েছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনাম, পশ্চিম জার্মানি থেকেও মানুষ নৌকাভর্তি কোরে, দেশের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে, প্রাচীর ভেঙ্গে, বেলুনে চোড়ে এমন বহুভাবে পালিয়েছে। হাজারে হাজারে প্রাণ হারিয়েছে সাগরে ডুবে, মেশিনগানের গুলি খেয়ে। সুতরাং সমাজতন্ত্র পারে নি মানুষকে শ্রেণিহীন কোরতে এবং পারবেও না। কেন পারে নি তার চুলচেরা ব্যাখ্যায় না গিয়ে এটুকু বোললেই যথেষ্ট যে, মানুষের জীবনে অর্থনীতিই সবটুকু নয়। সমাজতন্ত্র সমাজের সকল মানুষকে জোর কোরে অর্থনৈতিকভাবে সমান কোরতে চায়, একই খাদ্যতালিকার খাবার সবাইকে খাওয়াতে চায়, সে এটা বুঝতে অক্ষম যে আল্লাহ্ সকল মানুষকে এক যোগ্যতা, এক মানসিকতা, একই রুচি দিয়ে সৃষ্টি করেন নি, তাদের রেজেকের মধ্যে তারতম্য আল্লাহই দিয়েছেন এবং এই তারতম্য অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও প্রাকৃতিক (সুরা আন'আম : আয়াত ১৬৫)। এই আয়াতে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার কোরেছেন 'ফদল' অর্থৎ উত্তম। এখানেও অনুবাদ করা হয় 'শ্রেষ্ঠ'। এই অনুবাদের তারতম্য থেকেও মনে হোতে পারে যে এসলামে কিছু মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হোয়েছে এবং স্বভাবতই কিছু মানুষকে নিকৃষ্ট পদবাচ্য করা হোয়েছে, যা একপ্রকার শ্রেণিবৈষম্যেরই প্রকাশ। গুণে, সামর্থ্যে ও দক্ষতায় প্রতিটি মানুষ এক নয়। এক লোক তার কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতাবলে মাসে এক লক্ষ টাকা উপার্জন কোরতে সক্ষম, আরেকজনের যোগ্যতা হোল পাঁচ হাজার টাকা রোজগারের। এদের দু'জনকে একই মানের জীবনযাপনে বাধ্য করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সমাজতন্ত্র তাই কোরতে চেয়েছিল। প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি স্বাধীনচেতা মন আছে সমাজতন্ত্র তা স্বীকার করে না, তাই সে প্রত্যেকের উপার্জনকে জোর কোরে সরকারীকরণ করে। কিন্তু এসলাম মানুষের ব্যক্তিমালিকানাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে।

বর্তমানে মালিক ও শ্রমিক উভয় শ্রেণির মধ্যে চরিত্রগত ও মনমানসিকতার যে বিস্তর ফারাক বিরাজ কোরছে, সেই ব্যবধানকে বজায় রেখে মালিক শ্রমিককে এক কাতারে বসানো সম্ভব নয়। আগে তাদের মানসিক ব্যবধান ও চারিত্রিক ব্যবধান দূর কোরতে হবে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। ধরুন, আপনি একজন শিল্পপতি ও একজন শ্রমিককে নিমন্ত্রণ কোরেছেন। মালিক এসেছেন যথারীতি স্যুটপ্যান্ট পরে, সুগন্ধী মেখে আর শ্রমিক এসেছেন তার জন্য স্বাভাবিক সাধারণ বেশে। এবার তাদেরকে খেতে দিলেন মেঝেতে পাটি বিছিয়ে। শ্রমিক বোসে পড়লেন। মালিক ইতস্তত কোরছেন মলিন বেশধারী একজন সাধারণ শ্রমিকের সঙ্গে বসে খেতে। তাছাড়া তিনি মাটিতে বসে খেতেও অভ্যস্ত নন। শ্রমিকের সেদিকে দৃষ্টি নেই। প্লেটে ভাত বাড়াই ছিল। শ্রমিক নিজের জামায় এবং পাটিতে হাত ভালভাবে মুছে খেতে লেগে গেলেন। এই দৃশ্য দেখে মালিকের আর রুচি হোল না শুরু করল। আপনি মনে মনে ভাবছেন, শ্রমিক লোকটি হাত না ধুয়েই খানা শুরু কোরল? সে একা খেতে শুরু না কোরে অন্যদের জন্য একটু অপেক্ষা কোরতে পারতো না? বা অন্যদেরকে ডাকতে পারতো না? এই সাধারণ ভদ্রতা, সৌজন্যবোধগুলি কেন এই শ্রমিকদের নেই?

এই দৃশ্যটি যদিও গল্প আকারে বোললাম, কিন্তু ভেবে দেখুন এটাই বাস্তব কি না। শাসক-শাসিত, মালিক-শ্রমিক, বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের এই ব্যবধান ঘোঁচাতে প্রয়োজন এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ শ্রমব্যবস্থা যাতে উভয়পক্ষেরই মানসিকতা ও চরিত্রের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘোটবে। সেই জীবনব্যবস্থাই হোচ্ছে আল্লাহর সত্যদীন। সত্যদীনের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ফলে একদিকে শ্রমিক এমন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে, সৌন্দর্য্যবোধ, রুচিশীলতা, পরিচ্ছন্নতা, শিষ্ঠাচার, ভদ্রতাজ্ঞান, অন্যের জন্য ত্যাগের মানসিকতা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী তার মধ্যে সৃষ্টি হবে। আর অন্যদিকে মালিককে কোরবে নিরহঙ্কার, শ্রমজীবী মানুষের দুঃখকষ্টের অংশীদার, তাদেরকে ভাই মনে করার মত উদারতা ইত্যাদি সৃষ্টি কোরবে। এর একটি উদাহরণ পাওয়া যায় মিশর বিজয়ের ঘটনায়। আলেকজান্ড্রিয়া বিজয়ের পর একদিন কপটিক খ্রিস্টানরা নতুন শাসক মোসলেমদের দাওয়াত করে। উক্ত ভোজ অনুষ্ঠানে মিশরের কপটিকরা রোমান সেনাবাহিনীর আদলে অনুষ্ঠানকে বিভিন্ন স্তরে সাজায়। সেনাপতি ও জেনারেলদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা, অফিসারদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা সাধারণ সৈন্যদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। যখন খাবার পরিবেশন শুরু হোল দেখা গেল সেনাপতি ও জেনারেলদের আসনগুলি খালি। পরিবেশকরা তাদের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত খাদ্য নিয়ে অপেক্ষা কোরছে। এদিকে সৈনিকরা খাওয়া আরম্ভ কোরেছে। অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর খ্রিস্টানরা মোসলেম বাহিনীর কমান্ডার আমর ইবনুল আস (রা:) কে খেতে বসা কিছু সাধারণ সৈন্যের মধ্যে আবিষ্কার কোরল। কমান্ডার ও সৈনিকরা একই পাত্র থেকে খাবার তুলে খাচ্ছেন। খ্রিস্টানরা তাকে বিনীতভাবে বোললেন, 'জনাব, আপনাদের অফিসাররা কোথায়, আমরা তো আপনাদের জন্য অন্যস্থানে ভোজের আয়োজন কোরেছি।' এই কথা শুনে সেনাপতি আমর (রা:) বোললেন, 'এই তো আমার অফিসাররাও খাচ্ছেন।' এই অভিনব দৃশ্য ছিল খ্রিস্টানদের কল্পনারও অতীত। আমর (রা:) তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, 'এসলামের সৈনিকরা সকলে ভাই ভাই, এদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ (Division) নেই। সবাই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম কোরছে।' এই দৃশ্য দেখে খ্রিস্টানরা বিস্ময়ে হতবাক হোয়ে গেল। সৈনিকরা নয় কেবল, এসলামের ছায়াতলে যারা আশ্রয় গ্রহণ কোরবে তারা সকলেই ভাই-ভাই। আল্লাহর রসুলের আসহাবরা এভাবে তাঁর মুখের বাণীকে বাস্তবে রূপদান কোরেছিলেন।

আব্রাহাম লিঙ্কনের অনুসারী, পশ্চিমা সভ্যতা দাজ্জালের অনুসারীদের প্রতি আমাদের কথা হোল, সাধ্য থাকলে এই ঘোষণা দিনঃ

(১) কেউ কাউকে সিস্টেমের ফাঁদে ফেলে জোরপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য কোরবে না।

(২) ঘাম শুকানোর আগে শ্রমের ন্যায্য মূল্য পরিশোধ কোরতে হবে।

(৩) সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ কারও উপর চাপানো হবে না।

(৪) শ্রমিক প্রয়োজনে যেখানে খুশি, যার কাছে খুশি শ্রম দিয়ে উপার্জন কোরবে বা তার প্রয়োজন পূরণ কোরবে। এই ব্যাপারে তার উপর কোন রকম বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে না।

মাত্র কয়েকটি বোললাম, আরও আছে। বর্তমানে পৃথিবীর যে অবস্থা পশ্চিমা সভ্যতা দাজ্জাল সৃষ্টি কোরে রেখেছে, যদি হিম্মত থাকে তো এই ঘোষণাগুলি দিক দেখা যাবে কার শরীরে কত চর্বি জমা হয়, কার ব্যাংকে কত কোটি ডলার জমা হয়। উপরোক্ত নীতিগুলি এসলামের যা আল্লাহর রসুল বাস্তবায়ন কোরে গেছেন। আবার প্রকৃত এসলাম প্রতিষ্ঠা হোলে উপরোক্ত নীতিমালা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে এনশা'আল্লাহ।

[যোগাযোগঃ হেযবুত তওহীদ, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৮৫৩৯৯৩২২২

একটি প্রশ্নের জবাব ❖ আমেনা আক্তার

মেয়ে হোয়ে কেন পত্রিকা বিক্রি করো?

ধর্ম ব্যবসায়ী মোল্লারা বাস্তবেই মেয়েদেরকে ঘরের চার দেওয়ালের মধ্য অন্তরীণ কোরে রাখতে চায়, হেযবুত তওহীদের বেলায় এ কথাটি বহুবার বহুভাবে প্রমাণিত হোয়েছে। মোল্লারা যখন ফতোয়া দেয়, তাদের কথাগুলি মানুষ আল্লাহ-রসুলের কথা হিসাবেই বিশ্বাস করে। এটা শিক্ষিত শ্রেণির এক প্রকার অন্ধত্ব। তারা কখনও যাচাই কোরে দেখে না যে মোল্লারা যে ফতোয়া দিচ্ছে সেগুলি রসুলাল্লাহ ও তাঁর আসহাবদের জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কি না। এটা বিবেচনা না কোরেই সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসলাম-বিদ্বেষী কথা চালাচালি আরম্ভ হয় যে, এসলাম মধ্যযুগীয় বিধান, এটি মানুষকে কূপমণ্ডূক বানাতে চায়। আমরাও মোল্লাদের শেখানো কথাগুলিকেই এসলামের কথা হিসাবেই জানতাম। কিন্তু আল্লাহ কি এমন অন্যায় ব্যবস্থা মানুষের উপরে চাপিয়ে দিতে পারেন?

যামানার এমামের কাছে জানলাম মূল সত্যটা কী? তিনি আমাদের জানালেন এসলামে নারীদের ভূমিকা কী? আমি হেযবুত তওহীদে যোগ দিয়ে দেখলাম কিভাবে নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর সীমারেখার মধ্যে থেকেও একত্রে সর্বপ্রকার কাজ কোরে যাচ্ছে। পর্দা প্রথার নামে যে জগদ্দল পাথর মোল্লারা মেয়েদের উপরে চাপিয়ে রেখেছে সেটা যে এসলাম সম্মত নয়, তা আমি বুঝতে পারলাম। প্রকৃত এসলামের হেজাব ও নারী-নীতি চূড়ান্ত প্রাকৃতিক, যা কারও জন্যই মেনে চলা কষ্টদায়ক নয়। আমরা আল্লাহর সত্য এসলামটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছি, সর্বত্র কাজ কোরছি। এই কাজ কোরতে গিয়ে স্বভাবতই আমাদেরকে অনেক অদ্ভুত ও অসংলগ্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হোতে হয়। মোল্লারা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা ঘর থেকে বের হলে কেন? মেয়েদেরকে রাস্তায় বের কোরে দিয়ে হেযবুত তওহীদ তো এসলামটা ধ্বংস কোরে দিচ্ছে।' আমরা তাদেরকে বোলি, 'আপনারা তো ধ্বংসই হোয়ে আছেন। দাজ্জালের হুকুম মেনে আপনাদের ইহজীবন ধ্বংস হোয়েছে, আর মোল্লাদের বিক্রি করা এসলাম মেনে আপনাদের আখেরাত ধ্বংস হোয়েছে। হেযবুত তওহীদ এসেছে আপনাদেরকে এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কোরতে।'

আমরা যখন রাস্তায়, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে পত্রিকা, বই বিক্রি কোরি, তখন ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা প্রভাবিত এক শ্রেণির লোক বলে, 'রাস্তার মধ্যে এসলামের কথা বলে, এটা আবার কোন এসলাম? হকারি করে মেয়েরা, প্রত্রিকা বিক্রি করে মেয়েরা এটা তো কোন দিন দেখি নি।' আমরা মেয়ে দেখে প্রায়ই আমাদেরকে পত্রিকা বিক্রি কোরতে বাধা দেওয়া হয়, এমন কি পুলিশ ডেকে মিথ্যা কথা বলে তাদেরকে প্রভাবিত কোরে গ্রেফতার কোরতে বলে, অদ্ভুত ব্যাপার! অনেক পুলিশ অফিসারও একই মন্তব্য করেন, 'মেয়ে মানুষ পত্রিকা বিক্রি করে এমন কখনও দেখি নি।'

এ কেমন অন্যায় প্রশ্ন? তাদের এইসব অদ্ভুত ও যুক্তিহীন প্রশ্নের একটাই অর্থ দাঁড়ায়- মেয়েরা ইটভাটায় দিনমজুরের কাজ থেকে শুরু কোরে দেশ পরিচালনা পর্যন্ত সবই কোরতে পারবে, কিন্তু এসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা ঘর থেকেও বের হোতে পারবে না। জাতির এই মানসিক পক্ষাঘাত কবে ঘুঁচবে? ধর্মব্যবসায়ী এই মোল্লা শ্রেণীটি না হয় মানসিক ভারসাম্যহীন, কিন্তু প্রশাসনের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা কিভাবে কোনটা বৈধ, কোনটা অবৈধ সেই বোধ হারিয়ে ফেলেন? তারাও বিকৃত এসলামের দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে আইনের ভাষা ফেলে মোল্লাদের ভাষায় কথা বলেন। তাদের এইরকম অসঙ্গত আচরণের মূল কারণ, এসলামের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, এসলামে মেয়েদের কী ভূমিকা ছিল সেটা জানলেই আমাদের সমাজের মেয়েরা হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হোতে সক্ষম হবে, তাদের চিন্তা চেতনায় প্রবেশ কোরবে প্রকৃত স্বাধীনতার নির্মল আলোকরশ্মি।

মনে রাখা দরকার, অতীতে যখনই সমাজ অন্যায়, অবিচারে পূর্ণ হোয়েছে তখনই একদল মানুষ অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর মশাল নিয়ে তথা মুক্তির মশাল নিয়ে সত্য প্রতিষ্ঠায় নিজেদেরকে উৎসর্গ কোরেছে, তাদের ত্যাগ, তাদের ঘাম, তাদের রক্তের পিচ্ছিল পথ ধরেই এসেছে সত্য, এসেছে সুন্দর, এসেছে শান্তি। যুগেযুগে এই পরিবর্তনের পেছনে কিন্তু শুধু পুরুষ একা অবদান রাখে নি, সকল বিপ্লব ও সমাজের অভূতপূর্ব পরিবর্তনের পেছনে যে একদল মানুষের ভূমিকা ছিল তার সেই মানুষগুলির প্রায় অর্ধেকই ছিল নারী। পত্রিকা বিক্রি আমাদের পেশা নয়, এটি আমাদের সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সুতরাং মেয়েরা পত্রিকা বিক্রি কোরলে এটিকে ছোট কোরে দেখার কিছু নেই, বরং নারীদের মুক্তির জন্য এটি একটি উদাহরণ।

রসুলাল্লাহ কেমন ছিলেন?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

যে সময়টার (Period) কথা আলোচনা কোরতে যাচ্ছি তা হোল- মোসলেম নামধারী এই জাতিটির জাতিগতভাবে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থামিয়ে দেওয়া থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলির দাসে পরিণত হওয়া পর্যন্ত কয়েকশ' বছর। এই সময়কালের মধ্যে এই জীবন ব্যবস্থার ও এই উম্মাহর একটি ভয়ংকর ক্ষতি করা হোয়েছিল যার ফল আজও আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। নতুনভাবে গজিয়ে উঠা ধর্মের ধারক- বাহক, ধ্বজাধারী তথাকথিত আলেম-পুরোহিত শ্রেণির চুলচেরা বিশ্লেষণের ফলে জাতির মাঝে যে অনৈক্য ও ফেরকা- মাযহাব সৃষ্টি হোয়েছে তা ভবিষ্যতে এনশাল্লাহ লুপ্ত হোয়ে যেয়ে আবার আগের মত কঠিন ঐক্য এই উম্মাহর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে- যখন এই উম্মাহ আবার তার প্রকৃত আকীদা ফিরে পাবে। বিকৃত তাসাওয়াফের অন্তর্মুখী চরিত্রের ও সেরাতুল মোস্তাকীম ছেড়ে দিয়ে দীনের অতি বিশ্লেষণের বিষময় ফল উপলব্ধি কোরে উম্মাহ এনশাল্লাহ আবার একদিন সেরাতুল মোস্তাকীমের সহজ, সরল রাস্তায়, দীনুল কাইয়্যেমাতে অর্থাৎ তওহীদে ফিরে আসবে। কিন্তু এখন যে ক্ষতির কথা বোলছি সে ক্ষতির পূরণ কঠিন হবে। সেটা হোল- 'রসুলাল্লাহ'র সম্পর্কে এই উম্মাহর ধারণা বিকৃত এবং বিপরীতমুখী হোয়ে যাওয়া।

তিনি ছিলেন মানবজাতির ইতিহাসের সবচাইতে বড় বিপ্লবী, যিনি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁর হাতে গড়া মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ সৈন্যরা পৃথিবীর তৎকালীন দুইটি বিশ্বশক্তিকে (Super Power) একসঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার কোরে দিয়েছিলেন। যিনি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হোয়ে নাঙ্গা জুলফিকার হাতে তেজস্বী আরবীয় অশ্বে চড়ে প্রচণ্ড টর্নেডোর গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন সহস্র সুশিক্ষিত কাফের সেনাব্যূহে। কাফেরের ব্যূহ লণ্ডভণ্ড কোরে শত্রুকে আহত ও নিহত কোরে ছিনিয়ে আনতেন বিজয়। যিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কন্যা ফাতেমার হাতে যুদ্ধে ব্যবহৃত রক্তমাখা তলোয়ার তুলে দিয়ে বোলেছেন, "এই তলোয়ার আজ খুব কাজে এসেছে"।

এই সময়কালের পণ্ডিত, ফকীহ, মোফাস্সের মোহাদ্দিসরা যে অক্লান্ত ও অপরিসীম পরিশ্রম কোরেছেন এই দীনের কাজে, তা পড়লে, চিন্তা কোরলে বিস্ময়ে অবাক হোয়ে যেতে হয়। বিশেষ কোরে মোহাদ্দিসরা রসুলাল্লাহর (দঃ) হাদীস সংগ্রহ ও যাচাই কোরতে যে অধ্যবসায়, পরিশ্রম আর কোরবানি কোরেছেন তার তুলনা মানুষের ইতিহাসে আর নেই। কিন্তু এরা সবাই বিশ্বনবীর (দঃ) জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় যে ভাগটি সেটাকে যথার্থ গুরুত্ব দেন নি, সেটা হলো মহানবীর (দঃ) জীবনের সামরিক ভাগ। অবশ্য এটাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে পারেন নি কারণ কোর'আনে স্বয়ং আল্লাহ যে তাঁর নবীকে (দঃ) সংগ্রামের মাধ্যমে অন্য সমস্ত বিধানকে নিষ্ক্রিয় কোরে সমস্ত পৃথিবীতে এই জীবন ব্যবস্থা, দীনকে প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন (কোর'আন-সুরা আল ফাতাহ ২৮, আত তওবা ৩৩, আস-সাফ ৯)। এই উম্মাহকে যে আদেশ দিয়েছেন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, যে পর্যন্ত না পৃথিবী থেকে যুলুম, অত্যাচার, অশান্তি আর রক্তপাত দূর হোয়ে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠিত হয় (কোর'আন- সুরা আনফাল ২২-২৩)। এগুলো তো আর বাদ দেয়া সম্ভব নয়। তারপর বিশ্বনবীর (দঃ) জীবনী লিখতে গেলে তিনি যে সমস্ত জেহাদে, কিতালে এবং গাযওয়াতে (যুদ্ধ) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে সব লিখতেই হোয়েছে। কিন্তু লিখলেও তারা সেগুলির প্রাধান্য দেন নি, প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর জীবনের অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ

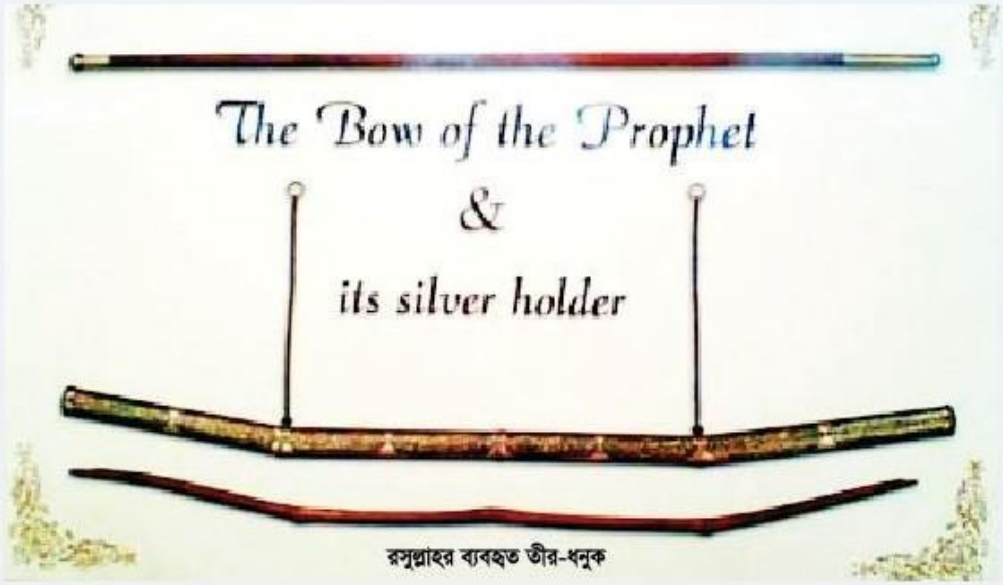

রসুল্লাহর ব্যবহৃত তীর-ধনুক

ব্যাপারগুলোয়। যে মানুষটির জীবনের মাত্র নয় বছরের মধ্যে আটাত্তরটি যুদ্ধ হোয়েছে যার সাতাশটি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার মধ্যে নিজে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ কোরেছিলেন নয়টিতে, আর বিভিন্ন দিকে সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন পঁয়ত্রিশটি যেগুলির সমরনীতি এবং ব্যবস্থাপনা তাঁকেই কোরতে হোয়েছিল, সে মানুষের জীবনটাকে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন যোদ্ধার জীবন বোলতে আপত্তির কোন কারণ আছে? প্রতিটি যুদ্ধের আগে কত রকম প্রস্তুতি নিতে হোয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা, সেগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা, শত্রুপক্ষের অবস্থান ও চলাচল, তাদের সংখ্যা ও অস্ত্র শস্ত্রের সংবাদ (Intelligent) রসদ সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি কত রকমের কত বন্দোবস্ত কোরতে হোয়েছে, তার উপর প্রতি যুদ্ধের বিভিন্ন রকমের সমস্যা উদ্ভূত হোয়েছে। সেগুলির সমাধান কোরতে হোয়েছে এই ব্যাপারে ঐ সময়ের পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমরা এখন যে তথ্য পাই তা অন্যান্য বিষয়ের তথ্যাদির তুলনায় অতি সামান্য। অথচ যাকে অতোগুলি যুদ্ধ কোরতে হোয়েছিলো তাঁর সম্পর্কে লিখতে গেলে তার সামরিক জীবনের খুঁটিনাটিই মুখ্য হোয়ে দাঁড়াবার কথা। কিন্তু হোয়েছে উল্টো। মহানবীর (দঃ) ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি কম প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাদের লেখায় আছে কিন্তু তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সংগ্রামের দিক এত কম স্থান পেয়েছে যে, মনে হয় তারা এটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরেছেন।

এর কারণ আছে। এই ফকীহ, মোফাস্‌সের, মোহাদ্দিস এরা সবাই আবির্ভূত হোয়েছিলেন এই উম্মাহ তাঁর নেতার (দঃ) প্রকৃত সুন্নাহ অর্থাৎ সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠা কোরে শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করার সুন্নাহ ত্যাগ করার পর। এই উম্মাহ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য তখন তাদের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হোয়ে গেছে, আকীদা বিকৃতি হোয়ে গেছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে গিয়েছিলো বোলেই তো তারা সংগ্রাম ত্যাগ কোরে খাতা কলম নিয়ে ঘরে বোসেছিলেন এই দীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ কোরতে, আরেক দল এসবও কিছু না কোরে খানকায় ঢুকে তাদের আত্মার ঘষামাজা কোরতে শুরু কোরেছিলেন, নেতার (দঃ) প্রকৃত সুন্নাহ সংগ্রাম মুষ্ঠিমেয় লোক ছাড়া কারোরই সম্মুখে ছিলো না। সুতরাং তারা যে ঐ সংগ্রাম সম্বন্ধে নিরুৎসুক, অনাগ্রহী হবেন তা স্বাভাবিক। তাই তাদের সারাজীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের, অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে যে দীন, জীবন ব্যবস্থা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত হলো তাতে বিশ্বনবীর (দঃ) প্রকৃত সুন্নাহর অর্থাৎ আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের, জেহাদের বিবরণ অতি সামান্য, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কম প্রয়োজনীয় অভ্যাসের বিশদ বিবরণ, দীনের গুরুত্বহীন ব্যাপারগুলির অবিশ্বাস্য বিশ্লেষণ। জনসাধারণের মনে দীন সম্বন্ধে আকীদা বোদলে যেয়ে ঐ রকম হোয়ে গেলো। ফলে আজ এ জাতির সামনে মহানবীর প্রসঙ্গ আসলেই তাদের কল্পনায় একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে যে, একজন পক্বকেশধারী দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ মানুষ, পরনে আরবীয় আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ি, হাতে তসবীহ, নতমস্তকে যেকর কোরতে কোরতে পথ চোলেছেন, ডানে বায়ে দৃকপাত কোরছেন না। কারও সাথে সাক্ষাৎ হোলে নানা প্রকার সদুপদেশ দিচ্ছেন। ঠিক অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা বিভিন্ন নাটকে সিনেমায় উপন্যাসে তাদের নবী ও ধর্মপ্রচারকদেরকে যেভাবে চিত্রিত কোরে থাকে (যদিও তাঁরা বাস্তবে বর্তমান অনুসারীদের ধারণার ন্যায় ছিলেন না), এই বিকৃত এসলামের অনুসারীরাও আমাদের নবীকে তেমন মনে করে। কিন্তু এরা কি একবারের জন্যও ভাবতে পারে যে, এরা যাঁর উম্মাহ হিসাবে নিজেদেরকে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ আখেরী নবী) তিনি ছিলেন মানবজাতির ইতিহাসের সবচাইতে বড় বিপ্লবী, যিনি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁর হাতে গড়া মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ সৈন্যরা পৃথিবীর তৎকালীন দুইটি বিশ্বশক্তিকে (Super Power) একসঙ্গে ভেঙ্গে চুরমার কোরে দিয়েছিলেন। যিনি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হোয়ে নাঙ্গা জুলফিকার হাতে তেজস্বী আরবীয় অশ্বে চড়ে প্রচণ্ড টর্নেডোর গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন সহস্র সুশিক্ষিত কাফের সেনাব্যূহে। কাফেরের ব্যূহ লণ্ডভণ্ড কোরে শত্রুকে আহত ও নিহত কোরে ছিনিয়ে আনতেন বিজয়। যিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কন্যা ফাতেমার হাতে যুদ্ধে ব্যবহৃত রক্তমাখা তলোয়ার তুলে দিয়ে বোলেছেন, "এই তলোয়ার আজ খুব কাজে এসেছে"। যিনি নিজ সৈন্যদের সমাবেশে নিজের তলোয়ার উর্ধে তুলে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা কোরেছেন, "কে আছে এর হক আদায় কোরবে?" (সেরাত ইবনে এসহাক), যিনি বোলেছেন, "আমি আদিষ্ট হোয়েছি মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহকে একমাত্র এলাহ (হুকুমদাতা) হিসাবে মেনে নেয় (ইবনে ওমর থেকে বোখারী, মোসলেম), যিনি বোলেছেন, "আমি যুদ্ধের নবী, আমি দয়ার নবী", যিনি বোলেছেন, "আমাকে কেয়ামত পর্যন্ত সকল যুগের জন্য তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হোয়েছে আর আমার রেযেক রাখা হোয়েছে বল্লমের ছায়ার নিচে (মুসনাদে আহমদ), যাঁকে কাফেররা এক মাসের দূরত্ব থেকে ভয় পেতো, যার অমিততেজা সাহাবীরা শত্রুর ছিন্নমস্তক এনে তাঁর সামনে পেশ কোরতেন, যিনি এমন এক সেনানায়ক- জীবনে কোন যুদ্ধে পরাজিত হন নি; সেই বিস্ময়কর অপরাজেয় সেনাপতির প্রতিকৃতি আজ আর এ জাতির মানসপটে ভেসে ওঠে না। না ওঠার কারণ এদের কাছে মহানবী এখন এক অন্য মানুষ। মহানবীর প্রকৃত চরিত্র, উম্মাহর কর্মকাণ্ড একদম ভুলিয়ে দেওয়া হোয়েছে, বাকিটুকু বিকৃত করা হোয়েছে ফলে তারা লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হোয়ে গেছে।

এই যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হোয়ে জাতি কয়েকশ' বছর কাটালো এই সময়টাতে পণ্ডিতদের ফতোয়াবাজী আর সুফীদের অন্তর্মুখী সাধনা খুব জোরেসোরে চোলছিলো। কাজেই পচনক্রিয়াও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিলো সমস্ত জাতির দেহময়। কিন্তু ওর মধ্যেও দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে যাদের মনে প্রকৃত দীনের আকীদা ঠিক ছিলো তারা তাদের কাজ কোরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ঐ পচনক্রিয়া জাতিকে এমন অবস্থায় নিয়ে এলো যে এর মধ্যে আর ফতোয়াবাজী ও তসবিহ টপকানো ছাড়া প্রায় আর কিছুই অবশিষ্ট রোইলো না। বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন, অংক ইত্যাদি সর্বরকম জ্ঞান থেকে এ জাতি বঞ্চিত হোয়ে এক অশিক্ষিত অন্ধ জাতিতে পরিণত হলো। অন্যদিকে জাতির স্রষ্টা বিশ্বনবী (দঃ) যে সামরিক প্রেরণায় একে এমন এক দুর্ধর্ষ, অজেয় জাতিতে পরিণত কোরেছিলেন যার সামনে বিশ্ব শক্তিগুলো পর্যন্ত ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে গিয়েছিলো, সে প্রেরণাও কর্পূরের মত উড়ে গিয়ে এক অন্তর্মুখী কাপুরুষ জাতিতে পরিণত হলো। যে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির চর্চা কোরে, গবেষণা কোরে এই জাতি পৃথিবীর জ্ঞানকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন সেই জ্ঞান এই জাতির শত্রু ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিগুলি লুফে নিয়ে তার চর্চা ও গবেষণা শুরু করলো আর এই উম্মাহ ওসব ছেড়ে দিয়ে বিবি তালাকের মসলা আর ফতোয়া নিয়ে মহাব্যস্ত হোয়ে পড়লো। এই উম্মাহর আহরিত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তির উপর খ্রিস্টান ইউরোপ তাদের প্রযুক্তির (Technology) সৌধ গড়ে তুললো এবং তুলে শক্তিমান হোয়ে এই উম্মাহকে সামরিকভাবে আক্রমণ করলো।

এটা ইতিহাস যে, এই আক্রমণ এই জাতি প্রতিহত কোরতে পারে নি এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট জাতি ইউরোপের বিভিন্ন জাতির পদানত দাসে পরিণত হোয়ে যায়। ইউরোপের ছোট বড় রাষ্ট্রগুলি এই উম্মাহকে টুকরো টুকরো কোরে কেটে খণ্ডগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ কোরে নেয়। প্রতিরোধ যে হয় নি, তা নয়, হোয়েছে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে। আর যে জাতির ঐক্য নেই সে জাতি শক্তিহীন, পরাজয় তার স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। ফকীহ, মোফাসসের, পণ্ডিতরা পাণ্ডিত্য জাহির কোরতে যেয়ে নানা মাযহাব ফেরকা সৃষ্টি কোরে ঐক্য ধ্বংস কোরে দিয়েছিলেন আর সুফীরা উম্মাহর হাত থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তসবিহ ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সংগ্রামী চরিত্রই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই উম্মাহ আর লড়বে কি দিয়ে ইউরোপের বিরুদ্ধে? সুতরাং যা হবার তাই হলো। যে উম্মাহর উপর বিশ্বনবী (দঃ) দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন সংগ্রাম কোরে সমস্ত পৃথিবীকে এই জীবন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এসে মানব জাতির মধ্যে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা কোরতে, সেই জাতি তার সংগ্রামী চরিত্র হারিয়ে নিজেই অন্যের ক্রীতদাসে, গোলামে পরিণত হলো।

সত্য কোথায়?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

বর্তমানে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ও জাতীয় জীবন অন্যায়-অবিচার, হানাহানি-রক্তপাত এককথায় অশান্তিতে পরিপূর্ণ। এর পেছনে অনেকে অনেক ধরণের কারণ দেখাতে পারেন তবে সেগুলো হলো আনুষঙ্গিক। সকল অশান্তির মূল কারণ হলো আমরা আল্লাহর দেওয়া জীবন ব্যবস্থা বাদ দিয়ে ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা অর্থাৎ দাজ্জালের তৈরি স্রষ্টাহীন, বস্তুবাদী, ভোগবাদী এক পেশে ভারসাম্যহীন জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ কোরে নিয়েছি। যার পরিণতিতে আজ জাতির আকাশে অশান্তির কালো মেঘ। এখন এর থেকে পরিত্রাণের জন্য বিভিন্ন উপায় খোঁজা হচ্ছে। স্বভাবতই রোগীর রোগ না চিনে অনুমানের ভিত্তিতে চিকিৎসা করলে যা হবার সম্ভাবনা থাকে তাই এই জাতির হচ্ছে। ভুল ঔষধ সেবন করলে যেমন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হয়, তেমনি এই জাতির অশান্তির মূল কারণ না জেনে অনুমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে দিন দিন আমরা আরো বেশি অশান্তিতে পতিত হোচ্ছি। যারা স্রষ্টার অস্তিত্বকে বিশ্বাস করতে রাজী নন, তাদের মত নিরেট, জড়বুদ্ধির অধিকারীদের কাছে আমার কোনো কথা নেই। ধোঁয়া থাকলেই যে আগুন থাকবে তা তারা বিশ্বাস করেন কিন্তু একই সূত্রভিত্তিক সৃষ্টি থাকলে তার স্রষ্টা অবশ্যম্ভাবী তা তারা মানতে নারাজ। আমার কথা হলো যারা নিজেদের মোসলেম দাবি করে, নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ্ব করে তাদের তো অন্তত এই বিষয়ে ভাবার প্রয়োজন যে, আমরা যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নামাজ পড়ি সে আল্লাহ আমাদের সামাজিক এবং জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য একটা সিস্টেমও দিয়েছেন। কাজেই সবাই মিলে বোসে দেখি না আল্লাহর দেওয়া ব্যবস্থাটিতে সংকট থেকে পরিত্রাণের কোনো উপায় আছে কিনা। যে দীন আমাদের জাহান্নামের সঙ্কট থেকে বাঁচাতে পারে সেই দীন কি এই সামান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ইত্যাদি সঙ্কট থেকে আমাদের পরিত্রাণ দিতে সক্ষম নয়? কিন্তু কোনো ভাবেই এই জাতি ঐদিকে পা বাড়াচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ দাজ্জালের অপপ্রচার। দাজ্জাল মিডিয়ায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় অনবরত এই কথা প্রচার করেছে এবং করছে যে, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত বিষয় জাতীয়ভাবে এটা কোনো সমাধান দিতে পারে না। হ্যাঁ, দাজ্জালের এই কথা সঠিক তবে সেটা এসলাম ধর্ম নয়, সেটা হলো খ্রিস্ট ধর্ম যার ব্যর্থতার পরিণামেই দাজ্জালের জন্ম হয়েছিল। এসলাম ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসযোগ্য তথাকথিত কোনো ধর্মের নাম নয়। এসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ এবং শ্বাশ্বত জীবনব্যবস্থা। এসলামে সকল সমস্যার সমাধান দেওয়া আছে। কাজেই এখন মোসলেমদের তাদের দাবিতে সত্যবাদী হওয়ার সময় এসেছে। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে প্রকৃত এসলামের পথে সর্বপ্রথম বাধা হলো ধর্ম ব্যবসায়ী শ্রেণি। কাজেই ধর্ম ব্যবসায়ী আলেম মোল্লাদের অনৈক্য, হানাহানি আর ফতোয়াবাজী, সংকীর্ণতা ইত্যাদি দেখে হতাশ হওয়া চলবে না। মনে রাখতে হবে ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লারা মসজিদে, খানকায়, আর মাদ্রাসায় যে এসলামটা চর্চা করছে ওটা আল্লাহ-রসুলের এসলাম নয়। ওটা বৃটিশ খ্রিস্টানরা তাদের ১৫০ বছর ধরে শিখিয়েছে। কাজেই ওটা দিয়ে ধর্ম ব্যবসা কোরে খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। প্রকৃত এসলাম কোনটা, কোন এসলাম দুনিয়া শাসন করবে, কোন এসলাম জাতীয়, রাষ্ট্রীয় সকল সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম; কোন এসলামে সকল মত, পথ, তরিকা, ফেরকা, বর্ণ মিটিয়ে দিয়ে সমস্ত মানবজাতিকে এক জাতি করা সম্ভব সেটা আল্লাহ দয়া কোরে যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে দান করেছেন। আমরা হেযবুত তওহীদ সেই সহজ সরল অনাবিল এসলামকে মানব জাতির সামনে পেশ করছি।

আমাদের অন্য কোনো অভিপ্রায় নেই, আমরা রাজনীতিও কোরি না। যারা জাতির কাণ্ডারীর দ্বায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আছেন আপনারাই সমাজ, রাষ্ট্র চালান কিন্তু মানুষদের বাঁচান, আর এজন্য আমাদেরকে কোনো বিনিময় দিতে হবে না। মানবতার কল্যাণই আমাদের উদ্দেশ্য, বিনিময়ে একমাত্র স্রষ্টার সান্নিধ্যই আমাদের কাম্য। মিথ্যার অন্ধকারে আচ্ছাদিত এই পৃথিবীকে সত্যের আলোয় আলোকিত করার দৃঢ় প্রত্যয়কে বুকে ধরে আমরা কিছু লোক একত্রিত হয়েছি। দাজ্জাল তথা ইহুদি-খ্রিস্টান সভ্যতা এখনও যাদের হৃদয়কে গ্রাস করতে পারেনি, মানবতাকে বিলুপ্ত করতে পারেনি তাদেরকে উদ্দেশ্য কোরে আমাদের আহ্বান হচ্ছে, "ধর্ম আজ কুক্ষিগত ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে; রাজনীতি আজ জিম্মি সন্ত্রাসীদের হাতে; ব্যবসা আজ জিম্মি মজুদদার, কালোবাজারী, ভেজাল মিশ্রণকারীর কাছে; শিক্ষা আজ পণ্য শিক্ষা বাণিজ্যের কাজে; আইন-শৃঙ্খলা পর্যুদস্ত সন্ত্রাসীদের হাতে। এক কথায় কোথাও সত্য নেই, সত্য আজ নির্বাসিত, সত্যবাদীরা পরাজিত। এমনি এক দুঃসময়ে আমরা দাঁড়িয়েছি মানবতার কল্যাণে সত্য প্রকাশের দৃঢ় প্রত্যয়ী হোয়ে- আমাদের সঙ্গে থাকুন"।

লক্ষ্মীপুরবাসীর প্রতি আমার কিছু কথা

-রুফায়দাহ পন্নী

আমরা এমন একটি সময় পার হোয়ে এসেছি যখন এই নোয়াখালীবাসী মাননীয় এমামুয্যামান সম্পর্কে অনেক মিথ্যা অপপ্রচার কোরেছে, অনেক বিরোধিতা কোরেছে। জনগণের কাছে এমামুয্যামানকে ছোট করার অনেক চেষ্টাই তারা কোরেছে। অতীতের এই স্মৃতির কারণে লক্ষ্মীপুরের এই সেমিনারে আমি না আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু লক্ষ্মীপুরবাসীর পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদা ইয়াসমিনের আন্তরিক আমন্ত্রণ আমি উপেক্ষা কোরতে পারি নি। আমি যে শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ কোরতে পেরেছি এজন্য আল্লাহর কাছে শোকর গোজার কোরছি। যদি না যেতাম তাহোলে আমি আপনাদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হোতাম এবং নোয়াখালীবাসী সম্পর্কে বড় একটি ভুলের মধ্যেই থেকে যেতাম। আমি আপনাদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ। অনুষ্ঠানের এক পর্যায়ে সবাই এক মিনিট দাঁড়িয়ে যে সম্মান আমাকে দিয়েছেন তাতে আমি অভিভূত এবং লজ্জিত বোধ কোরেছি। আমাদের এই সত্যের আহ্বান এবং যে কথাগুলি আমরা বোলছি সেগুলি কিছুই আমাদের নিজেদের কথা নয়, এতে আমাদের কোন কৃতিত্ব নেই। এর সমস্ত কৃতিত্ব ও সম্মানের প্রাপ্য মহান আল্লাহ। আমরা পথহারা ছিলাম, গোমরাহ ছিলাম, অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিলাম। যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী'র মাধ্যমে আল্লাহ ১৪শ' বছর পর হারিয়ে যাওয়া এসলামের সঠিক রূপ আমাদেরকে দান কোরেছেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হোয়ে, তাঁর কথা বোলতেই আমরা আপনাদের কাছে এসেছি। আমরা যা কিছু বোলি সবই তাঁর মাধ্যমে পাওয়া। তিনি যে সত্য মানবজাতির সামনে উপস্থাপন কোরেছেন সেই সত্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের সকলের এই স্বীকৃতি প্রকৃত অর্থে আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসুলের প্রতি এবং মাননীয় এমামুয্যামানের প্রতি। আজকে সমগ্র নোয়াখালীবাসীর কাছেই এমামুয্যামান স্বীকৃত হোলেন, উজ্জ্বল হোলেন। এজন্য আমি আপনাদের কাছে ঋণী। আপনাদের আন্তরিকতা, আতিথেয়তা, সৌহার্দের জন্য সর্বোপরি সত্যের প্রতি আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের এবং আমাদের মাঝে আল্লাহ তা'আলা এক নতুন ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের যোগসূত্র স্থাপন কোরে দিলেন যা আমাদের চলার পথকে আরও সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত কোরবে।

এ জাতি কী কোরে মোসলেম দাবি করে?

হুমায়ূন কবির

ঈদের দিন একটা দৃশ্য সর্বত্র দেখা গেল, পাড়া-মহল্লা, আনাচে-কানাচে গরু-ছাগল জবাই করা হোচ্ছে এবং টুপি-পাঞ্জাবী পরে ঈদের নামাজ পড়া হোচ্ছে। অর্থাৎ আমরা বুঝাতে চাইছি আমরা মুসলমান। কিন্তু কিভাবে? এই যে নামাজ পড়লাম, কোরবানি দিচ্ছি, দাড়ি-টুপি পাঞ্জাবী পড়ছি, কেউ কেউ হজ্ব কোরে আসছে। আমাদেরকে কে বলে দেবে এই জাতি আল্লাহর হুকুম, বিধান বাদ দেওয়ার কারণে এরা মো'মেনই না মোসলেম না? এই সরল প্রশ্নের উত্তর কে দেবে যে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কোর'আনের হুকুম বাদ দিয়ে কি কোরে মোসলেম দাবি করা যায়? এ জাতি যে দিন থেকে পৃথিবীময় সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দিয়েছে অর্থাৎ রসুলাল্লাহর এন্তেকালের ৬০/৭০ বছর পর তখনই তাদেরকে আল্লাহ মো'মেন এর খাতা থেকে বাদ দিয়েছেন। অতঃপর অন্য জাতির (এই উপমহাদেশে ব্রিটিশ জাতির) গোলাম হওয়ার পর মোসলেম থেকেই বহিষ্কার; তাদের তৈরি আইন-বিধান, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি অর্থাৎ এক কথায় জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার পর চূড়ান্তরূপে কাফের, জালেম, ফাসেক হয়ে যায় (সুরা মায়েদা ৪৪, ৪৫, ৪৭)। কাজেই এখন আগে আল্লাহর কলেমা, তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে মো'মেন হওয়া জরুরি। তারপরে যত পারা যায় ঐসব আমল। আজ দাঙ্গা, হাঙ্গামা, সন্ত্রাস, আতঙ্ক, হত্যা, ডাকাতি, ঘুষ, দুর্নীতি অর্থাৎ সর্বত্র এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতি বিরাজ কোরছে। এই শ্বাসরুদ্ধকর ভয়াবহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সেই পশ্চিমা প্রভুদের দ্বারে দ্বারে ধর্ণা দেওয়া হোচ্ছে। একবারের জন্যও এ জাতি চিন্তা করে না যে, আমরা এই যে সংকটে পড়েছি এর মূল কারণ তো আল্লাহর শাস্তি, আল্লাহর লানৎ। আল্লাহ আমাদেরকে এই শাস্তি, অভিশাপ দেওয়ার কারণ: আমরা মুখে দাবি করি মুসলমান, আইন-বিধান, হুকুম মানি এবং অনুসরণ কোরি ইহুদি খ্রিস্টান সভ্যতা দাজ্জালের। এখন এই লানৎ, শাস্তি থেকে পরিত্রাণের একটাই পথ আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া। সেই প্রকৃত, অনাবিল, শান্তিদায়ক, নিখুঁত, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা কোথায় পাওয়া যাবে?

সেটা আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান কোরেছেন। আজ সারা পৃথিবীতে যে এসলামটি চর্চা করা হোচ্ছে, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তবে, খানকায় যে এসলামটা শিক্ষা দেওয়া হোচ্ছে সেটা আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত এসলাম নয়। এই এসলাম ১৬০ কোটির এই জনসংখ্যাকে শান্তি দিতে পারে নি, অন্য জাতির গোলামী থেকে রক্ষাও কোরতে পারে নি। আমরা এমন এক এসলামের কথা বোলছি, যে এসলাম সমস্ত মানবজাতিকে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারবে, সমস্ত মানবজাতিকে একটি পরিবারে পরিণত কোরবে, এনশা'আল্লাহ।

উশৃঙ্খলতাই কি আধুনিকতার মানদণ্ড?

প্রতিটি জনগোষ্ঠীরই অবিচ্ছেদ্য অংশ এর সংস্কৃতি। সংস্কৃতির মধ্যেই প্রতিফলন ঘটে একটি জাতির নিজস্বতা, রুচি-অভিরুচি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা, জীবনবোধ, নীতিনৈতিকতা সবকিছুর। একটি জাতিকে পদানত করার সর্বাধুনিক পদ্ধতি হিসাবে বিবেচিত হোচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, অর্থাৎ যে কোন উপায়ে একটি জাতির উপরে অন্য একটি জাতির সংস্কৃতি চাপিয়ে দিয়ে চিন্তা চেতনার উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। তাহোলেই সেই জাতির লোকেরা মানসিকভাবে, চিন্তা চেতনায় দাসত্ব বরণ কোরে নেবে। যারা অন্যজাতির সাংস্কৃতিক দাস, চিন্তার দাস তাদেরকে দেশ আক্রমণ কোরে সরাসরি দাস বানানোর দরকার পড়ে না, তারা চেতনে-অবচেতনেও প্রভুজাতির আনুগত্যে নিষ্ঠাবান থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসন এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ। অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং আকাশ-সংস্কৃতির সুযোগ নিয়ে তারা প্রায় সারা পৃথিবীর মানুষকেই একটি অশ্লীলতানির্ভর জড়বাদী জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির দূষিত সাগরে বিলীন কোরে দিচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে মানুষ স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে সেই অপসংস্কৃতিকে মাথায় তুলে নিচ্ছে, ফলে যুবসমাজ হোয়ে পড়ছে আদর্শহীন, চরিত্রহীন, ভোগী ও অর্থবিলাসী এবং চরম আত্মকেন্দ্রীক। এসলামের বিরোধিতা, অশ্লীলতা, আনন্দ-উপভোগ আর উশৃঙ্খলতাই আধুনিকতার মানদণ্ড হোয়ে দাঁড়িয়েছে, পারিবারিক বন্ধনগুলি আলগা হোয়ে যাচ্ছে, বিস্তার লাভ কোরছে নেশাদ্রব্য, মরণব্যধি ছড়িয়ে পড়ছে সমাজদেহের সর্বত্র। আজ আমাদের কাছে পশ্চিমাদের গায়ের রং থেকে শুরু কোরে পোশাক, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, খাদ্যাভ্যাস, মতবাদ সবকিছুই সর্বশ্রেষ্ঠ। ঔপনিবেশিক যুগে যখন আমরা সরাসরি তাদের দাস ছিলাম, তখনও সাংস্কৃতিক ও মানসিকভাবে আমরা এতটা দাস ছিলাম না। আজ আমরা ভুলেই গেছি যে, মোসলেম জাতির একটি নিজস্ব সমৃদ্ধ সংস্কৃতি আছে যা আল্লাহ প্রদত্ত, একাধারে পবিত্র, উন্নত ও মহান। ইতিহাস বলে, এসলামের স্বর্ণযুগে ইউরোপীয়রা যখন মোসলেমদের দিকে তাকাতো, তাদের চোখে থাকতো মুগ্ধতার দৃষ্টি, তারা এসলামের শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, কলা, স্থাপত্যবিদ্যা, নবতর উদ্ভাবন প্রভৃতির শিক্ষা অর্জন কোরে গর্ব অনুভব কোরত। সেই শিক্ষকের জাতি আজ পশ্চিমা জাতিগুলির গোলামের চেয়ে বেশি কিছু নয়। এই অবস্থার একটি বড় কারণ এসলামের অপব্যাখ্যা। ধর্মজীবী আলেমরা ফতোয়ার ছুরি চালিয়ে মোসলেমের জীবন থেকে সঙ্গীত, অভিনয়, নৃত্য, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য নির্মাণ সবকিছুকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। তারা এগুলিকে একপ্রকার নিষিদ্ধ কোরে রেখেছে। অথচ এসলাম এগুলোর কোনটিই নিষিদ্ধ করে নি, নিষিদ্ধ কোরেছে এগুলির সঙ্গে অশ্লীলতার মিশেলকে। মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হোচ্ছে, আল্লাহর দেওয়া সেই প্রকৃত এসলামের রূপরেখা তিনি যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর মাধ্যমে মানবজাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। যামানার এমামের আদর্শে উজ্জীবিত, সত্য প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প 'দৈনিক দেশেরপত্র' সেই স্বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতার পুনর্নির্মাণে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। রসুলের প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থাটি আবারো মানব জাতির জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোলে পৃথিবী থেকে সকল প্রকার অন্যায় অপরাধ দূরীভূত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে এক অনাবিল শান্তিময় সমাজ।

পাঠকের প্রশ্নের উত্তর:

সনাতন ধর্মেও ধর্মব্যবসা নিষিদ্ধ

"ভারতীয় অবতার শ্রীকৃষ্ণ কে ছিলেন?" এই শিরোনামে আমার একটি গবেষণামূলক লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই পাঠকদের কাছ থেকে এ বিষয়ে অনেক ফোন পেয়েছি, অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ এঁরা নবী ছিলেন এই বিষয়টি প্রকাশ করার উদ্দেশ্য কী? আমি পরবর্তীতে "ভারতীয় অবতারদের প্রসঙ্গে কেন লিখছি" শিরোনামে এর যথাযথ জবাব লেখি যা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

এই লেখাটি যখন শুরু করি তখন আমি জানতাম এই প্রশ্নগুলি আসবে, আমি এটাও জানতাম যে, দুর্ভাগ্যজনকভাবে আল্লাহ রসুলের প্রকৃত শিক্ষা এবং কোর'আনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে যোজন যোজন মাইল দূরে সরে যেয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীদের কবলে পড়ে এসলামের এই বিকৃত চর্চা করার কারণে অধিকাংশ জনসংখ্যাই এই বিকৃত এসলামের চর্চা করছে এবং করবে। যেটা এসলাম নয়, যেটা রসুল বলেননি সেটাই তারা এসলাম মনে কোরে চর্চা করছে। সনাতন ধর্মের (হিন্দু) মধ্যেও একই অবস্থা।

আমি যখন কৃষ্ণ (আ:), বুদ্ধ (আ:) এর সম্পর্কে লেখা শুরু করলাম তখন এটা আমার আশঙ্কা ছিল যে মোসলেমদের মধ্য থেকে বিরোধিতা আসবে, সত্য না জানার কারণে। কৃষ্ণ (আ:) অবতার ছিলেন এটার প্রমাণ আমি করি নি, অনেক মনীষী করেছেন। আমি শুধু ঐ সকল মনীষীদের রেফারেন্স তুলে ধরেছি এবং তারা যে বক্তব্য দিয়েছেন ঐ সব মতামত ও বক্তব্য বিচার-বিশ্লেষণ করে, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও ইতিহাস থেকে যথেষ্ট যুক্তি প্রমাণ, তথ্য, উপাত্ত দিয়ে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় অবতাররাও আল্লাহর প্রেরিত নবী ছিলেন। আমি ভেবেছিলাম সনাতন ধর্মের - হিন্দুরা অন্তত এটা গ্রহণ করবে, কিন্তু আমি যখন তাদের কাছ থেকেও ফোন পেলাম যে তাদের অনেকে এর প্রতিবাদ করছে, আমার মনে প্রশ্ন আসলো- তাহোলে তারা কারা! আমি আশ্চর্য হলাম! তারপর আমার এই ধারণার অবসান হলো, যারা ধর্ম ব্যবসায়ী, ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষদের নানাবিধ কুমন্ত্রণা দিয়ে নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়, প্রকৃত সত্য ঘটনা, প্রকৃত সত্য ইতিহাস প্রকাশ কোরতে দেয় না, দিতে চায় না, এরাই তারা।

সুপ্রিয় পাঠক, আমি প্রথমে শ্রীগীতা (শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ এর সম্পাদনায় প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ থেকে প্রকাশিত) জ্ঞানযোগ অধ্যায়ের অবতার - তত্ত্ব থেকে কিছু অংশ তুলে ধোরছি, "বেদান্তমতে ঈশ্বর কেবল এক নন, তিনি অদ্বিতীয়, একবেমাদ্বিতীয়ম্, তিঁনিই সমস্ত, তিঁনি ছাড়া আর কিছু নাই, তিঁনি জগদ্রূপে পরিণত, সকলেই তাঁহার সত্তায় সত্তাবান, সকলেই তাঁহার মধ্যেই আছে, তিঁনি সকলের মধ্যেই আছেন, জীবমাত্রই নারায়ণ। কাজেই হিন্দুর পক্ষে অবতার-বাদ কেবল ভক্তি বিশ্বাসের বিষয়মাত্র নহে, উহা বেদান্তের দৃঢ় ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।"

একজন অবতার হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ও কার্য্য

শ্রী ভগবান্ বলিতেছেন, "আমার অবতারের উদ্দেশ্য-

১. দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ,
২. সাধুদিগের পরিত্রাণ ও
৩. ধর্মসংস্থাপন।

দ্বাপরযুগের শেষভাগে ভারতে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। সর্বত্র অধর্ম রাজত্ব করিতেছিল। সে সময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায়, তখন ধর্মদ্রোহী দুর্বৃত্তগণের অত্যাচারে দেশে বিষম আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল।"

আল্লাহ কোর'আনে বলছেন, "তিনিই তাঁহার রসুলকে

১. পথনির্দেশ ও
২. সত্য দীনসহ প্রেরণ করিয়াছেন,
৩. অপর সমস্ত দীনের উপর ইহাকে (আল্লাহর বিধান) জয়যুক্ত করিবার জন্য আর সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। [সুরা ফাতাহ্ - ২৮]

ইহাই আল্লাহর বিধান - প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাইবে না। [সুরা ফাতাহ্ - ২৩]

সৃষ্টিকর্তা এক ও অদ্বিতীয় এ কথা সনাতন ধর্মে যারা বিশ্বাসী তারা শুধু বিশ্বাসই করে না এ মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, অনুরূপভাবে মোসলেমরাও আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত। চিন্তাশীল পাঠকগণ, যার মন উদার, তিনি একটু চিন্তা করে দেখুন, যিনি ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, আল্লাহকে আলাদা করে দেখেন না, যা একই সত্তার ভিন্ন নাম। তাহোলে কী দাঁড়ায়! সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ যুগে যুগে মানব জাতীর কল্যাণে, মানব যাতে পৃথিবীতে সুখ, শান্তিতে বসবাস করতে পারে, তাই তিঁনি (সৃষ্টিকর্তা) তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির (অবতার, নবী - রসুল) মাধ্যমে দিক নির্দেশনা, জীবন বিধান দিয়ে পঠিয়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় মনু, যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণ, মহাবীর, ঈসা এবং সর্বশেষ মোহাম্মদ (সা:) কে অবতার, নবী- রসুল উপাধি দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেককে পাঠানোর উদ্দেশ্য একই ছিল, পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত যত মত পথ আছে, সব গুলোকে নির্মূল, উচ্ছেদ কোরে দিয়ে সৃষ্টিকর্তার পাঠানো জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত কোরে তা দিয়ে পৃথিবী পরিচালনা করা। কারণ আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন নাই।

তাই সনাতন ধর্মের অনুসারীরা প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ধর্মশাস্ত্র (বেদ, গীতা, মনুসংহিতা প্রমুখ) দিয়েই সমাজনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ প্রথা ইত্যাদি পরিচালনা করতো। ঐ সমস্ত ধর্মশাস্ত্রগুলো অবতারের মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহই পাঠিয়েছেন। ধর্ম নিয়ে ব্যবসা, সৃষ্টিকর্তা পছন্দ করেন না তাই তিঁনি ধর্ম বাণিজ্য নিষেধ করেছেন।

মনুসংহিতা - একাদশ অধ্যায়

ন যজ্ঞার্থং ধনং শূদ্রাদ্ বিপ্রো ভিক্ষেত কর্হিচিৎ।
যজমানো হি ভিক্ষিত্বা চণ্ডালং প্রেত্য জায়তে।।২৪।।

অনুবাদ: যজ্ঞের জন্য শূদ্রের নিকট ধন ভিক্ষা করা ব্রাহ্মণের কখনও কর্তব্য নয়। কারণ যজ্ঞ করতে মৃত্যুর পর প্রবৃত্ত হ'য়ে ঐভাবে অর্থ ভিক্ষা করলে চণ্ডাল হ'য়ে জন্মাতে হয়।

যজ্ঞার্থমথং ভিক্ষিত্বা যো ন সর্বং প্রযচ্ছতি।
স যাতি ভাসতাং বিপ্রঃ কাকতাং বা শতং সমাঃ।।২৫।।

অনুবাদ: যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য অর্থ ভিক্ষা করে তার সমস্তটা ঐ কাজে ব্যয় করে না, সে শত বৎসর শকুনি অথবা কাক হ'য়ে থাকে।

দেবস্বং ব্রাহ্মণস্বং বা লোভেনোপহিনস্তি যঃ।
স পাপাত্মা পরে লোকে গৃধ্রোচ্ছিষ্টেন জীবতি।।২৬।।

অনুবাদ: যে লোক লোভবশত: দেবস্ব অর্থাৎ দেবতার ধন এবং ব্রহ্মণস্ব অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, সেই পাপিষ্ঠকে পরলোকে শকুনির উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রে জীবন ধারণ করতে হয়।

"নিশ্চয় আল্লাহ যে গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন রাখে ও বিনিময়ে স্বল্পমূল্য গ্রহণ করে, তারা তাদের জঠরে আগুন ব্যতীত আর কিছুই পুরে না। উত্থানদিবসে (কেয়ামতের দিন) আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না, এবং তাদের পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।" [কোর'আন সুরা বাকারা - ১৭৪] তারাই সুপথের বিনিময়ে কুপথ, এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করছে, আগুন সহ্যে তারা কতই না ধৈর্যশীল। [কোর'আন সুরা বাকারা - ১৭৫]

ধর্মগুলির আদি ও অন্ত্যমিল

আল্লাহ আখেরী নবী মোহাম্মদের (দ:) আগমনের পূর্বে যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি জনপদে তাঁর নবী-রসুল বা অবতার প্রেরণ কোরেছেন। তাঁদের প্রতি সংশ্লিষ্ট নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় নাজেল কোরেছেন ঐশী গ্রন্থ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবীগণের জীবনাবসানের পর তাঁর অনুসারীরা সেই ধর্মের শিক্ষার অতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে কায়েমী স্বার্থরক্ষায় ধর্মকে ব্যবহার কোরতে গিয়ে সেগুলিকে বিকৃত কোরে ফেলেছে। এমন কি ধর্মগ্রন্থগুলির মধ্যেও নিজেদের মনগড়া কথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। ব্যতিক্রম হোচ্ছে শেষ গ্রন্থ আল কোর'আন। এর সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নেওয়ায় (সুরা হেজর ৯) ১৪০০ বছর পরেও এটি সম্পূর্ণ অবিকৃত আছে। তবে কোর'আনকে বিকৃত না কোরতে পারলেও কোর'আন এবং হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যার মাধ্যমে দীনের উদ্দেশ্য এবং প্রতিটি বিষয়ের ধারণাই পাল্টে দেওয়া হোয়েছে।

শেষ এসলামের আগের সেই বিকৃত ধর্মগুলির বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে তুলনামূলক বিচার কোরলে, তাদের গ্রন্থগুলি নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণী মন নিয়ে পড়লে এটা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয় যে, সকল ধর্মের অবতারগণ যে একই স্রষ্টার প্রেরিত, তাঁদের আনীত গ্রন্থাদিও সেই অভিন্ন স্রষ্টার নাজেলকৃত, এবং সব ধর্মগুলি যেন একই বৃক্ষের শাখা প্রশাখা। বর্তমানেও সেগুলির আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক মিল রোয়েছে কারণ আদীতে, ধারণাগতভাবে সবই এক ও অভিন্ন। পৃথিবীতে বিরাজিত ধর্মগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য অন্বেষণ কোরতে গিয়ে অপরিসীম শ্রমস্বীকার কোরেছেন বহু দার্শনিক ও গবেষক যাদের নামোল্লেখ করা সব সময় সম্ভব হয় না। তাদের লেখা থেকে তথ্যাদি নিয়েই আমরা এই আলোচনার একটি উপসংহারে পৌছানোর চেষ্টা কোরছি। সেইসব মনীষী ও গবেষকদের প্রতি আমার হৃদয়ের গভীর থেকে জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। এখানে এসলাম ও সনাতন (হিন্দু) ধর্মের মধ্যে কয়েকটি মিল তুলে ধোরছি।

ক্রম	বিষয়	দীনুল হক (এসলাম)	সনাতন (হিন্দু) ধর্ম
১.	একেশ্বরবাদ	লা ইলাহা ইল্লাহু, ওয়াহাদাহু, লা শারীকালাহু	একমেবাদ্বিতীয়ম ও এক ব্রহ্মা দ্বিতীয় নাস্তি
২.	দুই কাল	দুনিয়া ও আখেরাত	ইহকাল ও পরকাল
৩.	পরকালে দু'টি বিভাগ	মো'মেনরা জান্নাতে যাবে, কাফেররা জাহান্নামে যাবে	পুণ্যবানেরা স্বর্গে এবং পাপীরা নরকে যাবে।
৪.	জান্নাত ও জাহান্নামের রূপ	জান্নাত শব্দের অর্থই বাগান	স্বর্গ পুষ্পকাননময়
৫.	জীবন হরণের জন্য নির্দিষ্ট শক্তি	আজরাইল মালায়েক	যমদূত
৬.	ঈশ্বরের অবস্থান	আরশ, কুরসী	সিংহাসন
৭.	ঈশ্বর বন্দনা	হামদ (প্রশংসা) - এ আল্লাহ খুশি হন।	নাম-সঙ্কীর্তন ও স্তবগানে ভগবান প্রীত হন।
৮.	এবাদত উপাসনার পদ্ধতি	সালাতে সুরা কেরাত ও দোয়া	পূজায় মন্ত্রপাঠ আবশ্যক
৯.	পশু উৎসর্গের প্রথা	কোরবানি	বলি
১০.	আদি পিতা একজন	আদম (আ:)	মনু
১১.	আত্মশুদ্ধির জন্য উপবাস	সিয়াম (রোজা)	উপবাস
১২.	পুণ্যপ্রাপ্তির লক্ষ্যে ভ্রমণ	মক্কায় হজ্ব	গয়া, কাশি, বৃন্দাবন ইত্যাদিতে তীর্থযাত্রা
১৩.	সৃষ্টি পরিচালনার কাজে বিশেষ সৃষ্টি	মালায়েক বা ফেরেশতা	দেব-দেবী
১৪.	স্রষ্টার সামনে মাথা নত করা	সালাতে সেজদা	ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণিপাত
১৫.	প্রার্থনার পদ্ধতি	দুই হাত তুলে মোনাজাত	করজোড়ে প্রার্থনা
১৬.	এবাদতের নির্দিষ্ট স্থান	মসজিদ	মন্দির
১৭.	যেকেরের জন্য মালা ব্যবহার	তসবীহ	যপমালা
১৮.	ঈশ্বরের বাণী ধর্মগ্রন্থ থাকা	কোর'আন	বেদ

১৯.	ধর্মগ্রন্থ পাঠে পুণ্যলাভ	এসলাম ধর্মে যেমন এটি আছে	সনাতন ধর্মেও এটি আছে
২০.	এবাদতের নির্দিষ্ট সময়	সালাতের পাঁচ ওয়াক্ত	ত্রিসন্ধ্যা
২১.	যে কোন কাজ স্রষ্টার নামে শুরু করা	বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম	নারায়ণং সমস্কৃত্যং নবৈষ্ণব নরোত্তমম
২২.	নেতার আনুগত্যের শপথ	আমীরের বায়াত গ্রহণ	গুরুর দীক্ষা বা শিষ্যত্ব গ্রহণ
২৩.	স্বর্গে প্রমোদ সঙ্গী/সঙ্গিনী	পবিত্র সঙ্গিনী, গেলমান	অপ্সরী, গান্ধর্ব, কিন্নরা
২৪.	উপাসনার পূর্বে অঙ্গ ধৌত করা	অজু	আচমন
২৫.	নির্দিষ্ট দিকে ফিরে এবাদত	কাবার দিকে	সকালে পূর্ব দিকে, বিভিন্ন উপাসনা দশদিকে ফিরে করা হয়
২৬.	জান্নাতে যাওয়ার আগে নদ পার হওয়া	পুল সেরাত	বৈতরণী
২৭.	সাপ্তাহিক পবিত্র দিন	শুক্রবার	পবিত্র তিথি ও দিনক্ষণের অনেক হিসাব নিকাশ আছে।

এমন আরও বহু উদাহরণ দেওয়া সম্ভব, কিন্তু খোলা মন নিয়ে যারা উপরোক্ত সাতাশটি মিল লক্ষ্য কোরবেন তারা আশা কোরি বুঝতে পারবেন যে সব ধর্মের উৎসই এক। তাই কোন ধর্মের অবতারদের বিষয়ে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা, কোন ধর্মকে কটাক্ষ ও অবমাননা করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। ২০১৩ এর জানুয়ারী থেকে মধ্য সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কেবল ভারতেই ধর্মীয় সহিংসতার শিকার হোয়ে প্রাণ হারিয়েছে ১০৭ জন মানুষ। এই সংঘাতের শেষ কোথায় এবং কিভাবে এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন বিদ্বৎসমাজ। আমার মতে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই স্রষ্টা প্রদত্ত একই সনাতন ধর্মের (দীনুল কাইয়্যেমা) অনুসারী। পবিত্র কোর'আনে বহু আয়াতে এসলামকে দীনুল কাইয়্যেমাহ বা সনাতন, শ্বাশ্বত জীবনব্যবস্থা হিসাবে আখ্যায়িত করা হোয়েছে। হিন্দু বোলে আদতে কোন ধর্ম নেই, বেদ-পুরাণে হিন্দু শব্দের কোন উল্লেখও নেই। তারা আসলে সনাতন ধর্মের একটি প্রাচীন ও আঞ্চলিক সংস্করণের অনুসারী। সেই দীনের চূড়ান্ত বিকশিত ও সবশেষ সংস্করণ আল্লাহ পাঠিয়েছেন শেষ নবীর মাধ্যমে। বহুবিধ কারণে এই মহাসত্য বুঝতে ব্যর্থ হওয়ায় একই ধর্ম আজ বহু ধর্মে বিভক্ত হোয়ে আছে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। তারা প্রত্যেকেই যদি এটা অনুধাবন করে যে, আমাদের স্রষ্টা এক, আমরা এক আদম-হাওয়া থেকে এসেছি, সেই সূত্রে আমরা ভাই-বোন, বিভিন্ন সময় যে সকল নবী-রসুল, অবতারগণ এসেছেন তারা সকলেই আমাদের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত হোয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে নবী রসুল বোলে স্বীকৃতি দেওয়া আমাদের ঈমানের অঙ্গ এবং ফরদ। মানবজাতি এখন যে মহা সঙ্কটকাল অতিক্রম কোরছে এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ, আমাদের উচিত স্রষ্টার বিধানের দিকে ফিরে যাওয়া, অবতার প্রেরণের ধারাবাহিকতায় শেষ অবতার, নবী, রসুল মোহাম্মদের প্রকৃত শিক্ষাকে গ্রহণ করা, বর্তমানের বিকৃতটি নয়। জীবনব্যবস্থা ছাড়া মানুষ চোলতে পারে না। সঠিক কোন জীবনব্যবস্থা খুজে না পাওয়ায় তারা স্রষ্টাহীন, আল্লাহহীন, ইহুদি-খ্রিস্টান বস্তুবাদী সভ্যতা দাজ্জালের প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাগুলির অনুসরণ কোরছে, কিন্তু শান্তি পাচ্ছে না, নিরাপত্তা পাচ্ছে না। বরং দিন দিন মানুষ পশু পর্যায়ে উপনীত হোচ্ছে। দাজ্জালের অনুসারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকে ক্ষমতায় যাওয়ার সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার কোরছে, এজন্য তারা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ধর্মীয় দাঙ্গা বাঁধিয়ে রাখতে চায়। প্রকৃতপক্ষে দাজ্জালের অনুসারীরা কোন ধর্মই বিশ্বাস করে না। ওদের ধর্ম ক্ষমতা। কাজেই আপনারা যারা ধর্মের সত্যিকারের অনুসারী অন্তত আপনারা এক হোন, আপনারা যার যার ধর্মগ্রন্থে কি বলা আছে সেটা অনুসরণ কোরুন। দেখবেন সকল ধরণের দাঙ্গা, ফাসাদ, সন্ত্রাস নির্মূল হোয়ে যাবে, হোতে বাধ্য।

লেখক: প্রাবন্ধিক, কলামিস্ট ও যামানার এমামের অনুসারী
[যোগাযোগ: ০১৭৩০০১৪৩৬১]

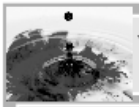

যদি সমাধান চাই

১। আগে বিশ্বাস কোরতে হবে আল্লাহ আছেন এবং তিনি সমস্ত কিছু যেমন সৃষ্টি কোরেছেন তেমন লালন পালনও কোরছেন।

২। তারপর বিশ্বাস কোরতে হবে, তিনি সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারেন।

৩। এরপর বিশ্বাস কোরতে হবে আমাদের জাতীয় ও সামাজিক সকল সমস্যার সমাধান দিয়ে আখেরী নবীকে পাঠানো হোয়েছে।

৪। আমরা এই যে সংকটে পড়েছি, সমস্যায় পতিত হোয়েছি এর থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর দেওয়া সমাধান আছে কি না সে দিকে কেউই যাই না।

৫। তাহলে আমরা মোসলেম হোলাম কি কোরে, মো'মেন হোলাম কি কোরে?

হেযবুত তওহীদ

কারা গোপন কারা প্রকাশ্য?

ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও, মানুষ হত্যা এবং নিরাপত্তাবাহিনীর ওপর হামলা করাই কি প্রকাশ্য রাজনীতির পরিচয়?

:আপনারা প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড কোরছেন না কেন?

:কেন, আমরা তো Absolutely Open, একদম প্রকাশ্য। আমাদের গোপন কোন কার্যক্রম নেই। আপনি প্রকাশ্য আর গোপন বোলতে আসলে কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

: এই ধোরুন, আপনারাতো মিটিং, মিছিল, হরতাল-অবরোধ, ঘেরাও, অনশন, দাবি-দাওয়া ইত্যাদি নিয়ে রাজপথে আন্দোলন ও বিক্ষোভ করেন না!

পাঠক, উপরোক্ত কথোপকথনটুকু একজন হেযবুত তওহীদের কর্মীর সাথে এদেশেরই একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার। খেয়াল করে দেখুন, কী অদ্ভুত ধারণা মানুষের! আজ তথাকথিত গণতন্ত্রের বুলি গিলিয়ে মানুষকে কোনটা গোপন দল আর কোনটা প্রকাশ্য দল তা নির্ধারণে কি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে! কোন দল প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য তার প্রমাণ রাস্তা-ঘাটে মিছিল মিটিং, হরতাল-অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর, জ্বালাও-পোড়াও, পথরোধ করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করার মত অপকর্ম ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়াকে বোঝানো হয়। কারণ তাদের এসব অপকর্মকে হাইলাইট কোরে মিডিয়া তাদের ছবি দেখায় সংবাদপত্রে, টেলিভিশনের পর্দায়। আর যারা এসব অপকর্মের সাথে নিজেদেরকে জড়িত করে না তারা বিবেচিত হয় গোপন দল হিসেবে। সত্যিই কি তাই? বরং তারাই গোপন যারা রাজনীতির নামে, গণতন্ত্রের নামে ঘুপচি গলি থেকে বেরিয়ে এসে গাড়িতে বোমা মারে, পেট্রোল ভর্তি বোতল ছুঁড়ে মারে গাড়িতে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের ধাওয়া দিলে আবার গলিতে প্রবেশ করে। রাতে তাদের ধোরতে যখন পুলিশ অভিযান চালায় তখন তাদের টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। 'ইঁদুরের গর্তে' লুকিয়ে থাকে।

সচেতন মানুষের উদ্দেশ্যে আমরা বোলতে চাই, হেযবুত তওহীদ এসব কর্মকাণ্ডকে অত্যন্ত গর্হিত কাজ মনে করে। হেযবুত তওহীদ মিটিং-মিছিল, বিক্ষোভ, গাড়িতে অগ্নিসংযোগ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে মারামারি না কোরে বরং অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ উপায়ে, কোন প্রকার আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজ না কোরে রাস্তাঘাটে, বাসে, ট্রেনে, লঞ্চে, বিভিন্ন অফিসে, হাটে-বাজারে, স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায়, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায়, হ্যান্ডবিল, সিডি, বই ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ্যে সাধারণ জনতার মাঝে প্রচার থেকে শুরু কোরে জাতীয় প্রেসক্লাব, পাবলিক লাইব্রেরীর সেমিনার কক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল, জাতীয় যাদুঘরের সেমিনার কক্ষসহ বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী-এমপিদের উপস্থিতিতে, এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করে, প্রকাশনাসমূহ বিলি কোরে নিজেদের বক্তব্য প্রকাশ করে যাচ্ছে। অদ্ভুত বিষয় হোচ্ছে তারপরও হেযবুত তওহীদকে বলা হয় গোপন দল। তাহোলে কি তারা এটাই চায় যে, হেযবুত তওহীদও অন্যান্য দলের ন্যায় রাস্তা-ঘাটে মিছিল-মিটিং কোরুক, গাড়ি ভাঙচুর কোরুক, রাস্তা অবরোধ কোরে মানুষের চলাচলে ভোগান্তি সৃষ্টি কোরুক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হোক?

কিন্তু তাদের এ আশা কোনদিনও পূর্ণ হবে না। কারণ হেযবুত তওহীদ জানে এসব কর্মকাণ্ড কোনভাবেই এসলাম সমর্থন করে না। আল্লাহর রসুল কোনদিনও সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়ে দীন কায়েমের জন্য কোন সংগ্রাম করেন নি। তাঁর সংগ্রাম ছিল মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্যায়-অশান্তি দূর কোরে অনাবিল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। হেযবুত তওহীদের অনুসারীরাও যেহেতু একই লক্ষ্যে নিজেদের জীবন-সম্পদ আত্মনিয়োগ কোরতে নেমেছে সেহেতু তারাও এসব কাজে নিজেদেরকে জড়িত কোরতে পারে না। অথচ জনগণের নামে রাজনীতি করে এমন দাবিদার প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এমনকি বহু এসলামি দলও কথিত গণতান্ত্রিকদের সাথে তাল মিলিয়ে এসব অপকর্ম কোরে যাচ্ছে। এসব কাজ না করায় যারা বলে হেযবুত তওহীদ গোপন- তারা চায় হেযবুত তওহীদও অনুরূপ অপকর্মের সাথে নিজেদের জড়িত কোরে অন্যদের সাথে মিশে যাক। তাদের জেনে রাখা উচিত, হেযবুত তওহীদ দীন কায়েমের ক্ষেত্রে শেষ রসুলকে অনুসরণ কোরে থাকে। সুতরাং রসুলাল্লাহ যা করেন নি তা কোনদিনও হেযবুত তওহীদ কোরবে না। হেযবুত তওহীদ আল্লাহর মনোনীত দল, হেযবুত তওহীদের এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী আল্লাহর মনোনীত এমাম। সুতরাং হেযবুত তওহীদ কখনোই এসব কাজে নিজেদের জড়িত কোরে তাদের দাবি মোতাবেক আত্মপ্রকাশ কোরবে না, কোরতে পারে না। হেযবুত তওহীদ তার গৃহীত নীতির আলোকে, কাউকে কোনপ্রকার কষ্ট না দিয়ে, কারো বিন্দুমাত্র অধিকার লঙ্ঘন না কোরে, আইন লঙ্ঘন না কোরে তাদের কাজ নিরন্তর চালিয়ে যাবে। এই শান্তিপূর্ণ কর্মকাণ্ড থেকে কারো কথায়, কারো চাওয়ায় হেযবুত তওহীদ কর্ণপাত কোরবে না। সুতরাং হেযবুত তওহীদকে এসব বোলে কোন লাভ হবে না। এসব বিষয়ে হেযবুত তওহীদ সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন।

[যোগাযোগঃ হেযবুত তওহীদ, ০১৬৭০১৭৪৬৪৩, ০১৭১১০০৫০২৫, ০১৯৩৩৭৬৭৭২৫, ০১৮৫৩৯৯৩২২২, ০১১৯১৩৬৭১১০, ০১৭৮২১৮৮২৩৭, ০১৫৫৯৩৫৮৬৪৭]